KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007/	Place of Publication : কবিতাভবন, 202 রাসবিহারী এভিনিউ
Collection : KLMLGK	Publisher : বুদ্ধদেব বসু
Title : কবিতা (KAVITA)	Size : 5.5" x 8.5"
Vol. & Number : 12/2 15/2 15/3 17/2 18/2	Year of Publication : Dec 1946 March 1950 (বৈশাখ ১৩৫৭) Dec 1952 Feb 1954
	Condition : Brittle ✓ / Good ✓
Editor : বুদ্ধদেব বসু	Remarks :

C.D. Roll No. : KLMLGK

কলিকাতা-৭০০ ০৭৩

কবিতা

১৭শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা পৌষ ১৩৫৯ ক্রমিক সংখ্যা ৭২

বিষ্ণু দে, অমিয় চক্রবর্তী, অশোকবিজয় রাহা,
লোকনাথ ভট্টাচার্য, দিলীপ দত্ত, হেমেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়
অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, রাজলক্ষ্মী দেবী, সঞ্জয় ভট্টাচার্য
বুদ্ধদেব বসু, শামসুর রাহমান

র‍্যাঁবো, চীনে কবিতার অনুবাদ

অন্তঃসার : অন্নদাশঙ্কর রায়
বুদ্ধদেব বসুর কবিতা : 'দ্রৌপদীর শাড়ি'—রমেন্দ্রকুমার আচার্যচৌধুরী

সমালোচনা
বু. ব., অশোক মিত্র

বার্ষিক চার টাকা প্রতি সংখ্যা এক টাকা

সম্পাদক : বুদ্ধদেব বসু

সিগনেট প্রেসের বই

বাংলাগ্রন্থজগতে অকল্পনীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন

পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ

অচিন্ত্যকুমারের স্মরণীয় সাহিত্যকীর্তি

৬ মাসে চতুর্থ মুদ্রণ প্রকাশিত হল

সচিত্র সুলভ সংস্করণ ৪৲

পল্লীপ্রকৃতি আর কৈশোরের
ভীরু ভালোবাসার কাহিনী

দুইবাড়ি

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

দাম ২॥৹

রচনাগুণে এ-গ্রন্থের সমতুল্য আত্মজীবনী
বাংলাসাহিত্যে বিরল

শিবনাথ শাস্ত্রীর

আত্মচরিত

দাম ৪৲

'দিনদুপুরে' লেখিকার
বড়োদের জন্য প্রথম উপন্যাস

শ্রীমতী

লীলা মজুমদার

হাস্তরসসমুজ্জ্বল আনন্দবেদনাময়
একটি পরিচ্ছন্ন কাহিনী। ২।৹

অবনীন্দ্রনাথের শিল্পসাধনায় একটি বিরলতম
নিকটচিত্র উদ্ঘাটিত হয়েছে এ-গ্রন্থে

স্মৃতিচিত্র

প্রতিমা দেবী

অপ্রকাশিত ৮টি মূল্যবান আলোকচিত্র

দাম ২।৹

আধুনিক বিখ্যাতদের মধ্যে নির্জনতম কবির
তিরিশটি কবিতার সংকলন

বনলতা সেন

জীবনানন্দ দাশ

দাম ২৲

আজবদেশে অবাকহাসির কথা

সুকুমার রায়ের

হ-য-ব-র-ল

নতুন সংস্করণ ১।৹

তরুণতর কবিদের মধ্যে যিনি
অগ্রণী — সেই

নরেশ গুহ-র

দুরন্ত দুপুর

প্রথম কাব্যসংকলন ২৲

স্বদেশী এবং বিদেশীয় চিত্রী-কবি-সাহিত্যিকদের
বিষয়ে মৌলিক আলোচনা

সাহিত্যের ভবিষ্যৎ

বিষ্ণু দে

দাম ২৲

সিগনেট বুকশপ

১২ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট

১৪২/১ রাসবিহারী এভেনিউ

কবিতা

পৌষ ১৩৫৯

সপ্তদশ বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা

ক্রমিক সংখ্যা ৭২

অনুবাদগুচ্ছ

বিষ্ণু দে

শেক্‌সপীয়র : সনেট

১৫

যবে বিবেচনা করি যা কিছু বিকাশ পায় সবই
পরম পূর্ণতা পায় শুধু এক মুহূর্তের তরে ;
এ বিরাট রঙ্গমঞ্চ যা কিছু দেখায় সবই ছবি,
যেখানে নক্ষত্রগ্রহ প্রচ্ছন্ন প্রভাবে ভাষ্য করে ;
যবে স্পষ্ট দেখি গাছ-মানুষের বিকাশ সমান
একই আকাশ তলে উৎসাহিত এবং সংবৃত,
যৌবনের রসে দৃপ্ত, উন্নত হলেই ক্ষীয়মাণ,
জাঁকজমকের সাজ ব্যবহারে বিচ্ছিন্ন বিস্মৃত ;
তখন অনিত্য এই অবস্থার ভাবনা চিন্তায়
তোমাকেই দেখি সেরা যৌবনের সমৃদ্ধ আসনে,
যেখানে আকখুটে কাল আর ক্ষয় ব্যস্ত মন্ত্রণায়
তোমার যৌবন-দিবা দুষ্ট-রাত্রে বিষাবে কেমনে ;
কালের বিরুদ্ধে মহাযুদ্ধে তাই, প্রেমের বিক্রমে,
সে যতো তোমাকে হানে, আমি ততো জীয়াই কলমে ॥

১৮

তোমার উপমা আমি দেব নাকি বসন্তের দিনে ?
তুমি আরো রমণীয়, শীত উষ্ণে আরো যে সুষম।
চৈতালির রূঢ় বায়ু হানা দেয় মাধবীবিপিনে,
বৈশাখের চুক্তিপত্রে দিনের মৌরুসী বড়ো কম,
থেকে থেকে আকাশের চোখ জ্বলে প্রবল বিক্রমে,
এবং সুন্দর সবই সৌন্দর্য খোয়ায় কালক্রমে
দৈবে কিংবা প্রকৃতির রূপান্তরে রূপসজ্জাহীন ;
আবার কখনো দেখি স্বর্ণবর্ণ মেঘার্ত মলিন।
অথচ তোমার নিত্য বসন্তের নেই ক্ষয়রোগ,
তোমার রূপের স্বত্ব হাতছাড়া হয় না ভূলোকে,
মৃত্যুর ছায়ায় ঘোরো মৃত্যুর এ দন্তের সুযোগ
হবে না সেদিনও, যবে কালোত্তর হবে নিত্যশ্লোকে,
যতোদিন মানুষের প্রাণ আছে, আছে দু নয়ান
ততোদিন আয়ু এর, এ তোমাকে করে প্রাণদান ॥

৪৪

আমার দেহের জড়সত্তা যদি চিন্তা হত, তবে
মর্মঘাতী দূরত্বেও থামত না আমার প্রয়াণ,
কারণ তখন আমি যেতাম এ স্থানবদ্ধ ভবে
বহুদূর পার হ'য়ে যেখানে তোমার অবস্থান।
কিছুই না আসে যায় চলি আমি কোথায় পা ফেলে
তোমার বিরহে স্থূল পৃথিবীর দূরতম কোণে,
কারণ ত্বরিত চিন্তা জলস্থল লঙ্ঘে অবহেলে,
যেখানে সে ঠাঁই চায় চ'লে যায় ভাবামাত্র মনে।

তবু আহা ; চিন্তা হানে : আমি কেন চিন্তা নই, ধিক্,
তবে তো যেতাম শতক্রোশ পারে তুমি যেইখানে,
কিন্তু ক্ষিতিঅপ্ দুই উপাদানে আমার অধিক,
কালের মর্জিই ভরসা ব'সে থাকি রোরুদ্য-নয়ানে,
কিছুই আয়ত্তে আসে নাকো এই মন্থর সত্তার,
গুরুভার অশ্রু ছাড়া, চিহ্নমাত্র দোঁহার ব্যথার।

৫৫

মর্মর মিনার কিংবা রাজন্যের সুবর্ণ-তোরণ
বাঁচে না এ পরাক্রান্ত কবিতার মতন অক্ষয়,
জেনো তুমি দীপ্তি পাবে এরই মাঝে অম্লান কিরণ
কালের কাদায় লেপা ধূলিকীর্ণ পাথরে তো নয় ;
যখন ধ্বংসাশী যুদ্ধে মূর্তি সব হবে ধূলিসাৎ,
যখন লড়ায়ে সব স্থাপত্যের কীর্তি হবে লীন,
তখনও চণ্ডীর খড়্গ, যুদ্ধের প্রচণ্ড অগ্নিপাত
ব্যর্থ হবে, স্মৃতিলিপি তোমার রইবে ক্ষয়হীন।
তোমার জয়াভিযানে সর্বলোপী বৈরী-যে মরণ
সেও পিছু হ'টে যাবে, তোমার প্রশস্তি নিরবধি
ভ'রে দেবে অনাগত যুগান্তরে সবার নয়ন,
উত্তরাধিকার যারা ব'য়ে চলে প্রলয় অবধি,
সুতরাং যতোদিন কালান্তরে না হও উত্থিত
তুমি বাঁচো এতে, যতো প্রেমিকের নয়নে জীবিত ॥

৭৩

আমার মাঝারে হের সংবৎসরের সেই কাল,
যখন পল্লব পীত দুয়েকটি ঝোলে কি না ঝোলে,

হিমবায়ে কম্পমান শাখে শাখে বিবিক্ত করাল,
কীর্তন-আঙিনা শূন্য, মধুক্ষরা পাখী গেছে চ'লে।
আমার মাঝারে দেখ সন্ধ্যারাগ গোধূলিলগনে,
সূর্যাস্তের পরে যবে দিন চলে পশ্চিমসাগরে,
আর ধীরে ধীরে কৃষ্ণরাত্রি তাকে টানে আলিঙ্গনে,
মৃত্যুর দ্বিতীয় সত্তা, ঘুমে ঢাকে সবাকে আদরে।
আমার মাঝারে দেখ সেই বহ্নি দীপ্তশিখা যার
আপন যৌবনভস্মে জ্বলে যায় তবু লেলিহান,
যেন বা আপন চিতা জ্বালে যেথা মৃত্যু অনিবার,
জীয়ায় যা তাকে, সেই পুষ্টিতেই তার অগ্নিবাণ।
এতো তুমি বোঝো, তাই ভালোবাসা প্রবল তোমার
অচিরে হারাবে যাকে দাও তাকে প্রেমের সংকার॥

১৩০

আমার প্রিয়ার চোখ নয় বটে সূর্যের সমান,
প্রবাল অনেক লাল সে-বিম্বাধরের তুলনায়,
তুষারে শুভ্রতা যদি খোঁজো তবে বক্ষ তার ম্লান,
কেশ যদি তন্ত্রী হয়, কালো তার বাঁধা সে-মাথায়।
দেখেছি গোলাপ নানা বর্ণময়, লাল ও পাণ্ডুর,
গোলাপ দেখিনি কিন্তু আমি তার গালে চুমা খেয়ে,
এবং আতরে নানা গন্ধ বটে অনেক মধুর
আমার প্রিয়ার শ্বাস-প্রশ্বাসের বাতাসের চেয়ে।
ভালোবাসি কথা তার তবু আমি এই সত্য জানি
সংগীতের স্বর নয় হোক না মধুর তার গলা।

অবশ্য দেখিনি আমি দেবী কোনো কিংবা দেবযানী,
তবু জানি প্রিয়া যদি চলেন তা স্থূলমর্ত্যে চলা।
অথচ আশ্চর্য জানি আমার প্রেয়সী সুনিশ্চয়
ব্যর্থ যতো তুলনার মতোই, সে তুল্য যার নয়॥

স্পেন্সর : আমোরেত্তি

৭৫

একদিন লিখেছিনু তার নাম সমুদ্রসৈকতে,
কিন্তু ঊর্মিদল এল, নাম ধুয়ে দিল জলোচ্ছ্বাসে ;
আবার লিখিনু নাম অন্য হাতে ভিন্ন রীতিমতে,
শিকারী জোয়ার এল আমার শ্রমকে নিল গ্রাসে।
বলিল সে, হে দাম্ভিক কেন মাতো এ-ব্যর্থ প্রয়াসে,
এই অবিনশ্বরতা নশ্বরের মাঝে অন্বেষণ,
কারণ স্বতই আমি বাঁধা সেই ক্ষয়নাগপাশে
এবং আমার নামও মুছে যাবে অচিরে তেমন।
নহে তা, (কহিনু আমি) নীচ সব বস্তুর মরণ
হোক ধূলিমৃত্তিকায়, তুমি হবে যশেই অমর,
তোমার দুর্লভ গুণ কাব্যে আমি করি চিরন্তন,
তোমার নামটি লিখি ঊর্ধ্বলোকে গৌরবে ভাস্বর,
যে লোকে, যখন মৃত্যু সারা বিশ্ব করিবে শাসন
আমাদের প্রেম রবে ভাবী জীবনের উজ্জীবন॥

চারটি কবিতা

পাখিনা

অমিয় চক্রবর্তী

মেঘুল-ওকের সারি উঁচু মাথা গাছ,
দূর পথিকের চোখে আলোর আড়াল
নীলের লঙ্ঘন ঐ শৈলসারি
—ফেলে চলে যাব কাল।

চেয়েছি কি বেশি, বলো,
শুধু যদি দুদণ্ড চেয়ে থাকি
এই বজ্র আকাশ-ধারণ
অরণ্যের শান্তি অকারণ
তোমার প্রশান্ত দৃষ্টি-নেশা
একটু হাসির দৃষ্টি-নেশা ?
রক্তে যদি ফিরে ডাকে নিঃস্বনিত গাছের শরীর
আমার শরীর বোধে, নির্ঝরিত সন্ধ্যাগ্নি আবির
শ্যামতা মিশ্রিত মনে, মুহূর্ত তন্ময় সেই কালে
তুমিও তো এসেছিলে সৃষ্টির সকালে।
তাই সর্বাস্তির পরিচয়ে
খুঁজেছি স্বর্গতা বুকে, হে পাখিনা, তোমারো প্রত্যয়ে
শেষ লগ্নের বিনিময়ে।
ভোরে দরজায় আসি সেই
ধুলোয় রেখেছ দেখি তুমি-হারা শূন্য ভরা নেই—
এই কি তোমার দান একাকীর পথে
মৌন অদেখা ক্ষণে বিদায়-বিহীন শেষ ব্রতে ?

সব মুছে দেওয়া বিশ্বে খুলে দিলে দিক—
মহা পাওয়া কোথা আছে তারি আরো করেছ পথিক ॥

২৮ জুলাই
ভেরনন্ট

শ্রীমান শ্রীমতী

দুজনায় যেতে ঐ নীল সিন্ধু-পাখী ওড়া তীরে
ভালো করত যদি দেখত হলদে বালির অন্যতায়
আলগা পৃথিবী, নিত একান্ত প্রেমের ক্ষণ ঘিরে
মধ্যাহ্ন মাস্তুলে কাঁপা চিক্কণ রোদ্দুরে আড় চোখে
বৃহৎ আত্মীয় বিশ্ব : প্রত্যহ সন্তার কিনারায়
ব্রুকলিন থেকে মাঝি যেখানে নৌকো বেয়ে যায়,
ব্যস্ত সংসারের দূরে দূরে জাল-ফেলা, শূন্য চিরে
ঠক্ ঠক্ শব্দ ওঠে হাতুড়ির, লাল ধোঁয়া ঢোকে,
প্রচণ্ড খাটুনি ঐ মিস্ত্রিদের।—কেননা, একদিন
স্বচ্ছ ব্যবধানে বেলা শ্রান্ত হয়ে এলাবে যখন
অত্যন্ত দুঃসহ লাগবে দুজনারও নেশির লক্ষণ
মহত্তীর ছায়া, যদিও উজ্জ্বলতর। সর্বলীন
সেই ঘনিষ্ঠতা ওরা হাতে-হাতে ধ'রে যাতায়াতে
মুগ্ধ বুকে জানবে যত, কাছে পাবে মৃত্যুলগ্নহীন
আপন প্রাণের ছবি, সিগারেট-মুখে বেঞ্চে ব'সে
না-দাড়ি-কামানো বুড়ো প্রসন্ন রুক্ষ দৃষ্টিপাতে
দেখে সমুদ্রের জল, হঠাৎ জেটির ভিড়ে পাশে
মজায় গভীর তারি পরিচয় : ওরা বোঝে, তাই

এই বেলা, সুধায় নিবিড় বেলা, অন্তরঙ্গ তলে
ওদের তন্ময় যেন ছোঁয় আরো ; চলেছি সবাই
মস্ত জাহাজের ভোঁ কাছে দূরে ডাকে যাত্রীদলে ॥

লিরিক

জানতামই না যখন দুজন, সে তো অনেক দূর ;
তারো চেয়ে দূর যে আজ দুপুর।
এক মুহূতে ছিন্ন সুতো সমস্ত এই বেলা
অলীক আলোয় খেলে খেলা ;
কলোরাডোর সূক্ষ্ম পাহাড় সোনায় মেলা
ঘরহারা রোদ্দুর।
ল্যাভেণ্ডারের গুচ্ছ ভরা বাগান কোণে
লিণ্ডেনের এই বীথি,
ছায়া-রাস্তা পায়ের শব্দ মিথ্যে গোনে ;
অদৃশ্যে বিস্মৃতি
শোনে আপন সুর।
মধ্যে শুধু নীল অনন্ত দিক-দিগন্ত নয়
নয়তো কেবল ছলছল উতল সমুদ্দুর—
দিনে দিনে ঝিলিক গাঁথা চেনার সমন্বয়
প্রাণের খেয়ায় উধাও উদাস বাতাসে বয়।
পৃথিবীতে লগ্ন ছিল এই মিলনের ঘর,
এসেওছিলেম দুজনে——তারপর ?

১৬০৪ য়ুনিভর্সিটি ড্রাইভ

পরে পরে নয়, এক সঙ্গে। ঝিরিঝিরি
চুলে ছোঁয় বন্য হাওয়া, কানে ঝাউগাছ শিরিশিরি,
কফির সুরভি, টোষ্টে মাখনের স্বাদ মধু-মেশা,
ভোর সাড়ে সাতটার গোলাপী আলোর ঠাণ্ডা নেশা—
মুহূর্তের এই মূর্তিবহ
শরীরী চৈতন্যে বাঁধা আমার সংগ্রহ
ওড়ি-কলোনের গন্ধমাখা,
বন্ধু, তোমায় আজ নীলান্তে পাঠাই দূর পাখা।
ঝগ্ ঝগ্ ট্রেন শব্দ, ষ্টেশনের স্তব্ধ রোদ,
কাল রাত্রে স্বপ্নে দেখা ডোবা বোধ,
পৌঁছন তবুও ফিরে-চাওয়া ;
ক্লাশে পড়ানোর ঘণ্টা ঐ বাজে, ব্যস্ত হাওয়া।
লরেন্সে আমার বাড়ি, সোনার গমের কিনারায়
বিদায় সিঁড়িতে তার এ লগ্ন দাঁড়ায়—
(ঠিকানা এখনো সেই : ষোলো-শূন্য-চার)
কলোনের স্মৃতি-গাঁথা নাও উপহার ॥

চিত্রলেখা

অশোকবিজয় রাহা

৫

তালের সারির পিছে দূর-মাঠে দিগন্তরেখায়
চকচকে সূর্যের চাকায়
উঠে এল ঝকঝকে দিন
কাশফুল-মেঘটুকু ছিঁড়েখুঁড়ে হলো চিহ্নহীন।

মাঠের এপারে
কৃষ্ণচূড়া-বীথির কিনারে
সবুজ শাখায় ঢাকা
রঙিন ধনুক-পথ আঁকা।

চারদিক ফাঁকা,
শুধু এক সাঁওতাল মেয়ে
গাছের আড়াল থেকে দূর-মাঠে চেয়ে,—
হাসে দু'টি গাল
কানের পলাশফুলে লাল
খোঁপায় ফুটেছে এক জবা
অপরূপ শোভা।

৬

কোথায় অদৃশ্য ট্রেন ঝড় তুলে ছোটে ঊর্ধ্বশ্বাস
হু-হু ক'রে নেমে এল চাঁদ-জ্বলা মাঠের আকাশ
দিল দেখা
একভিড় তালগাছ, দূর-গ্রাম, মৌন বনরেখা।

এখনো গতির বেগ পাখা ঝাপটায়
তালের পাতায়
এখনো গতির রেশ কেঁপে-কেঁপে যায়
শরবনে হাওয়ার রেখায়
এখনো আধেক ছবি ফুটেছে কায়ায়
আধখানা জড়ানো ছায়ায়
তবু এই চাঁদ-জ্বলা মাঠ
অসীম কালের টানে ছুটে এসে বেঁধেছে জমাট।

৭

শেষরাত
কৃষ্ণপক্ষ-চাঁদ
বাড়ায়েছে শীর্ণ হাত
পেয়ারার ডালে,
ঘুমন্ত খড়ের চালে
ডানা নেড়ে
বাদুড়ের কালো ছায়া উড়ে যায় পাখসাট মেরে,
এক ধারে
পড়েছে গভীর ছায়া ইঁদারার পারে।

হঠাৎ চমক ভাঙে পেঁচার চীৎকারে।
রাত কত ?
ভয়ার্ত বোবার মতো
তাকায় পেপের গাছ থতমত।

৮

জ্যোৎস্নার মাঠে
রাত কাটে।
দূর দিয়ে একসারি তালগাছ হাঁটে
তাকালেই থমকে দাঁড়ায়
চোখ টিপে চায়।
একটি পাণ্ডুর মুখ কে যেন বাড়ায়
রুক্ষ চুল উড়ে পড়ে গায়
ক্লান্ত স্বরে বারেক শুধায়
'কবে এলে ?'
শরবন একপাশে হেলে।

চোখ পড়ে পূবে
ছায়া গেছে উবে,
ধূ-ধূ সাদা
জ্যোৎস্নার ধাঁধা
দিগন্ত ভরাট
মরুমাঠ—
ধবধবে খাঁ-খাঁ
শূন্য ফাঁকা
নিশ্চল বালির ঢেউনাচ।
শুধু এক উটপাখি গাছ
মাঝখানে একপায়ে খাড়া
সঙ্গ ছাড়া।

৯

শোনো
জ্যোৎস্নারাতে কোনো
নিজের ছায়ার সাথে শূন্যমাঠে ঘুরেছ কখনো ?
হঠাৎ হয়েছে মনে তুমি এক ছায়ার শরীর
শিরায়-শিরায় কাঁপে শরের পাতার শির্‌শির্‌
চেতনায় মিশে গেছে ঝিঁঝিঁ-ডাকা ঘাস
ঘাসের নিঃশ্বাস
নিঃশব্দ ডানায় ভেসে হয়ে গেছ দূরের আকাশ ?

তা'হলে দেখেছ তুমি দূরে সেই ধবল বিশাল
নিরবধি কাল,
আলোর জোনাকিগুলি ঝাঁকে-ঝাঁকে ওড়ে তার গায়ে
কত তারা গিয়েছে হারায়ে।

র‍্যাঁবো-র তিনটি কবিতা

অনুবাদ : **লোকনাথ ভট্টাচার্য**

স্বরবর্ণ

আ কৃষ্ণ, অ শ্বেতবর্ণ, ই রক্ত, উ হরিৎ, ও নীল :
স্বরবর্ণ, বলি আমি তোমাদের গূঢ় পরিচয় :
আ, তমসাঙ্কিত নীবীবাস, ক্রূর পূতিগন্ধময়
রোমশ মৌমাছি তারে অবিনয়ে স্ফীত করে, খিল

মহা গুহার ; অ, বাষ্প অথবা শিবির ঋজুরেখ,
বল্লম হিমবাহের, শ্বেত রানা, কম্প্র পুষ্পদল ;
ই, লোহিত, রক্ত ইতস্তত, হাসি কোপন চঞ্চল
অথবা মদের শেষে ম্লান মধু অধরে ক্ষণেক ;

উ, আকাশবৃত্ত, স্পন্দমান দিব্য হরিৎ সাগর
শান্তি তাপিত জীবের, যে-শান্তি নিখিল দুঃখহর
আঁকে স্নিগ্ধতার রসে চিন্তাশীল কুঞ্চিত কপোলে ;

ও, পরম ভেরী বাজে তীক্ষ্ণধার অপূর্ব স্বরিত,
লোক-লোকান্তরে দেবযোনি-পুরে মৌন সচকিত :
—ওমেগা, তোমার দৃষ্টি কাঁপে নীল কিরণ-হিল্লোলে।

শাশ্বতী

আবার ফিরে পেয়েছি তারে!
কারে ?—শাশ্বতীরে।
সমুদ্র সে সূর্যে মেশে
মিলন-মন্দিরে।

মৃত্যুঞ্জয়ী আমারো মন
তোমারি ঋতে চলে,—
যদিও রাত প্রবঞ্চিত,
আগুনে দিন জ্বলে।

চতুর তুমি, তোমাতে তাই
যত্নে পরিহৃত
প্রাকৃত সুখ-দুঃখাবেগ—
তুমি অকুণ্ঠিত।

—আশার পথে কখনো নয়,
উদয়-পথে নয়।
সাধ্য আর সাধনা, সবই
বিড়ম্বনাময়।

আয়তি চিরকালের তরে
আছে তো জানো প্রিয়,
রেশমে ঢাকা আগুন সেই
তোমার বহনীয়।

আবার ফিরে পেয়েছি তারে!
—কারে ?—শাশ্বতীরে।
সূর্য আর সমুদ্রের
মিলন-মন্দিরে!

মাতাল তরণী

নিঃসাড় নদীর জলে ভেসে যেতে তরণ-চঞ্চলে
কখন খেয়াল হ'ল গুণ-টানা মাঝিদের টান
থেমে গেছে : হতভাগ্য, প'ড়ে মত্ত বর্বর-দঙ্গলে
রক্তাক্ত খুঁটির গায় বিদ্ধ তারা—নগ্ন, লম্বমান।

ধারি নাকো কোনো ধার মাঝি-মাল্লাদের, অথবা কে
ফ্লাণ্ডার্সের শস্যবাহী, বণিক বিলাতী কার্পাসের—
মাঝিদের চেঁচামেচি ক্ষান্ত হ'লে পর নদী ডাকে
আপন খুসির পথে অন্তহীন অবগাহনের।

ছুটেছি—শুনেছি যেই মদমত্ত জোয়ার-জঙ্গিমা,
আমি গত শীত ঋতু, বধির করেছে কেউ তারে
শিশুরও মস্তিষ্ক হ'তে! উপদ্বীপে বিড়ম্বিত সীমা
টলমল করে যার ঘন অন্ধ আবেগ-সঞ্চারে।

ঝঞ্ঝা হ'ল আশীর্বাদ সাগর-যাত্রার চেতনায়—
অল্পালোকে মূঢ় চোখ ; দশ রাত্রি তবু সারাক্ষণ
সমানে নেচেছি চ'লে তৃণ হ'য়ে তরঙ্গ-মালায়—
যে-তরঙ্গ, লোকে বলে, মৃতের নিয়ন্তা সনাতন।

অম্ল আপেলের মাংস শিশুর যত না প্রিয়—তার
চেয়েও সুন্দর এই হরিতাভ জলের উত্তালে
দীর্ণ দেবদারুজাত তরী ; নীল মদের ঝঙ্কার
আমায় বিধৌত ক'রে বেসামাল তোলে দাঁড়-হালে।

তখন হ'তেই সুরু সাগরিকা কবিতায় স্নান,
নিখিল আকাশগ্রাসী ছায়াপথ, তারার মূর্ছনা :
যেখানে বিবর্ণ এক তন্দ্রালস মুগ্ধ ভাসমান
তিমির গভীর স্বপ্নে ক্রমাগত ডোবে অন্যমনা।

সেখানেই অতর্কিতে সমুজ্জ্বল দিনের পীড়নে
নীলিমা রঞ্জিত হয় ধীর ছন্দ-সুষমার রসে—
কী উগ্র মদিরা তার, কী বিপুল বীণার রণনে
প্রেমেরে গাঁজিয়ে তোলে খর তিক্ত রক্তিম উরসে।

চিনি সেই সন্ধ্যা, ঘনঘূর্ণি, জলস্তম্ভ—আর্তি তার
বুক-ফাটা আকাশের লেলিহান বিদ্যুৎ-শিখায় :
এক ঝাঁক পারাবতে ভোর জাগে যখন আবার
হয়তো দেখেছি তারে লোকে যারে বলে দেখা যায়!

দেখেছি শায়িত সূর্য কলঙ্কিত অপূর্ব ভীষণে,
জমাট বেগুনি তার উদ্ভাসিত মহিম অক্ষরে—
ঢেউ যেন নট এক বিস্মৃত কালের প্রকরণে,
খড়খড়ি ঝিলমিল খোলে বোজে দূর দূরান্তরে!

স্বপ্ন দেখি, ঝলসিত তুষারের নীলিম রজনী
চুম্বনেচ্ছু হ'য়ে ধীরে ছোঁয় যেন সাগর-নয়ন—
অশ্রুত প্রাণের রসে নৃত্য করে শিরা উন্মাদনী,
সাগর, জোনাকি-জ্বলা, জাগে এক পীত জাগরণ।

সারা মাস আমি যেন আস্ত এক পাগল গোয়াল
পবন-বন্ধুর বেগে ছুটে চলি শৈল-অতিক্রমে—

ভাবিনি মেরীর দুই আলোকিত চরণের তাল
বিক্ষুব্ধ সাগরও রাখে লাগামের পাষাণ সংযমে।

দেখেছি, ঠেকেছি কত—জানে না তো কেউ, অপরূপ
জলপরী, মানুষের মতো গাত্র, শ্বাপদ-নয়না—
আঘাতে সে বারবার কী জানায়, সে-বাণী নিশ্চুপ ;
দিগন্ত-বীণার তারে ইন্দ্রধনু অবর্ণবরনা।

অপ্রমেয় কত জলা দেখেছি ফেনাতে ; জাল, যার
রন্ধ্রে রন্ধ্রে কত তিমি অবহেলে প'চে গ'লে যায়—
নিঃস্রোতা কোথাও তুলে অকস্মাৎ মন্দ্রিত ঝংকার
আবর্তে প্রপাত হেনে ধ্যানমগ্ন দিগন্ত কাঁপায়।

আকাশ দাবাগ্নি-জ্বলা, গ্লেসিয়ার, হিরণ্য ভাস্কর,
শুক্তিরূপী ধারা, লুপ্ত ভগ্নপোত অতল পিঙ্গলে :
অগণ্য মৎকুণ যার ছিঁড়ে খায় ভীম অজগর—
উচ্ছিন্ন বৃক্ষের কাণ্ডে অন্ধকার সুরভি সঞ্চলে।

কেন যে শিশুরা নেই তাই ভাবি যখন লহরী
এমন সুনীল আর স্বর্ণ-শফরীর লাস্য আঁকা।
—নিরুদ্দেশ এই যাত্রা ধন্য করে ফেনিল মঞ্জরী,
কী এক পবনে আমি বারবার হয়েছি বলাকা।

প্রান্তদেশে কটিবন্ধে আবদ্ধ শহীদ—নিরুপায়
নাচে ক্ষুব্ধ সমুদ্রের বিরহ-নিঃশ্বাসে অনুক্ষণ :
আঁধার পুষ্পের দ্যুতি পীত হ'য়ে নয়নে ঘনায়,
আর আমি ব'সে থাকি নতজানু নারীর মতন।···

তরী হ'ল দ্বীপ যেন—তীরে তার খঞ্জন-নয়না
পাখির পুণ্যায় আর কিচির মিচির কলস্বরে—
যতই ছুটেছি চ'লে, শ্লথবন্ধে হারায় চেতনা,
পিছনে ডুবতে চেয়ে ঢেউগুলি ঘুমে ঢুলে পড়ে।···

বক্রের করাল চুলে সমুচ্ছল হারালো তরণী—
ঝটিকা-তাড়িত আমি ঈথারের হীন বিহঙ্গমে :
স্থির জানি কোনো পোত নেই কোনো বিশল্যকরণী
জলোন্মত্ত দেহটাকে রক্ষা করে দুরন্ত দুর্গমে···

ধূম্র এক কুয়াশায় চ'ড়ে ব'সে স্বচ্ছন্দ গতিতে
সুকবির অনবদ্য চাটনি সেই আরক্ত আকাশ
প্রাকারের মতো দীর্ণ করি, যার সর্বগাত্রটিতে
নীলার অনন্ত ক্লেদ, সবিতার শৈবাল-নির্যাস।

শিরায় শিরায় রক্তে বহ্নিমান বিদ্যুৎ-চেতনা,
ক্ষিপ্ত পাটাতন, মসীকৃষ্ণ সিন্ধুঘোটকের দল
ইঙ্গিতে দেখায় পথ—বর্ষা যেন মূর্ত উন্মাদনা,
আকাশ সাগরাতিগ অগ্নিমুখী আভায় বিহ্বল।···

যোজন যোজন শুধু দৈত্য আর আবর্ত করাল :
ক্রূর সেই নিদারুণ চেতনায় কাঁপি থরথর—
এরাই নিশ্চল নীলে শাশ্বতীর রচে ইন্দ্রজাল ;
কোথায় য়ুরোপ-কূল সুপ্রাচীন প্রাকার-মুখর।

দেখেছি দ্বীপের পুঞ্জ নক্ষত্র-খচিত সারে সার,
উদাত্ত আকাশে যার যাত্রী শোনে চির-আমন্ত্রণ :

—অতলান্ত এই রাতে ঘুমাও, না হয়েছ ফেরার,
হে ভবিষ্য বীর্যবান, লক্ষ-লক্ষ স্বর্ণ হীরামন ?—

তবু বৃথা কাঁদা ! জানি মর্মান্তিক উষার লালিমা,
চন্দ্রমা অসহ চিরকাল, তিক্ত রবি-রশ্মি-কণা :
কটূস্বাদ প্রেমে শুধু স্ফীত হবে মাতাল জড়িমা—
হায় দীর্ণ তরী, হায় নিরুদ্দেশ সমুদ্র-মন্ত্রণা !

যদি চাই য়ুরোপের সলিল, হোক তা সরোবরে
স্নেহের শীতল জল—যার কোলে সুরভি সন্ধ্যায়
দুঃখভারে পঙ্গু এক শিশু শেষ পরিহার করে
ভঙ্গুর তরণী তার বসন্তের পতঙ্গের প্রায়।

তোমার ক্লান্তির স্নানে আর আমি নেই ঢেউ, নেই,
জল আমি কাটব না কার্পাসবাহীর চোখে ; মিছে
উদ্ধত নিশানে তার জৌলুস-শিখায় পাল্লা দেই,
কী কাজ সাঁতারে গাধাবোটেদের কটাক্ষের নিচে !

চীনে কবিতা

অনুবাদ : দিলীপ দত্ত

৭

লেখা থামিয়ে চেয়ে রইলুম পশ্চিমের জানলা দিয়ে
পাইন আর বাঁশবনে অসীম নিস্তব্ধতা।
চাঁদ উঠল, ঘরে এল ঝিরঝিরে হাওয়া ;
হঠাৎ মনে হল যেন পাহাড়ে সন্ধ্যা নেমেছে।
তাই ঝিমোতে-ঝিমোতে স্বপ্ন দেখলুম
চলে গেছি দক্ষিণ পশ্চিম প্রান্তরে
শুয়ে আছি সিয়েন-উ মন্দিরে।
ঘুম ভাঙতে কানে এল দূর প্রাসাদের ঘড়ির
টুংটাং শব্দ
তখনো মনে হল ওটা যেন পাহাড়ে ঝরনার
ঝরঝর ধ্বনি।

(পো-চু-ই : নবম শতক)

৮

সুসময় আসবে না আর।
এক মুহূর্ত পরে
আমাদের বিদায় নেওয়ার পালা হবে শেষ।
বাঁকের মাথায় এসে পৌঁছই,
কী কোরবো ভেবে পাই না।
দুধারে ধানের খেত
আমার হাত তোমার হাতে, কথা নেই মুখে।

ছোটো-ছোটো শাদা মেঘ ভেসে যায় আকাশে ;
আবার কোথাও গিয়ে জোট বাঁধে ;
এলোমেলো বাতাস স্বর্গে গিয়ে মেশে।
এখন থেকে অনেকদিন আমাদের আর দেখাই হবে না,
অতএব এস আরো কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকি
চুপ করে।
ইচ্ছে হয় প্রভাতের পাখায় ভর দিয়ে
তোমার সঙ্গে উড়ে যাই
তোমার যাত্রার একেবারে শেষপ্রান্তে।

(লি লিং : খৃঃ-পূঃ প্রথম শতক)

৯

চোখ গেছে, বই খুলতে সাহস হয় না :
বৃষ্টিতে ভিজে গেছে রাস্তা, কাদা জমেছে ;
বন্ধুরা কেউ যে আসবে
তারও উপায় নেই।
সারা দিন কী ক'রে কাটাব,
এই বারান্দায় একশোবার
পাইচারি করেই কি কাটবে সারাটা দিন ?

(ওয়াইয়াং ওয়ান-লি : ১১২৬-১২০৬ খৃঃ)

১০

যদিও সত্তর বছর বয়স হল, তবু বই ছাড়া থাকতে চাই না :
মনে হয় একমাত্র মৃত্যু এসেই কেড়ে নিতে পারবে সেগুলো।

উঠে পড়ি, জানলার বাতিটা উস্কে দিয়ে
কাটিয়ে দি এই ঝড়বাদলের রাত।

(লু ওয়াই উ : ১১২৫-১২০৭ খৃঃ)

১১

বসন্ত প্রভাতে ঘুমিয়ে ছিলুম
ভোরের কথা খেয়ালই করিনি,
চারদিক থেকে খুশিভরা পাখীদের
কিচিরমিচির শব্দ কানে আসছিল।
মনে পড়ল রাত্তিরে ঝড় হয়েছিল।
না জানি কত সুন্দর ফুল ঝরে পড়েছে।

(লি পো : ৭০১-৭৬২ খৃঃ)

দুটি কবিতা

হেমেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

প্যারিস : সেপ্টেম্বর '৫০

হঠাৎ হেমন্ত আসে। আল্‌স্‌-এর বুক-ভাঙা কনকনে মেঘ
দিগন্ত-বিলাসী চোখে গাঢ় পুরু বোরখা পরায়।
ভিজে মাঠ স্যাঁৎসেঁতে অপকৃষ্ট কবিতার মতো,
সপ্‌সপে ঝরাপাতা বিষাদের কার্পেট ছড়ায়।

নির্বোধ নীলিমা ধোওয়া আকাশের প্রবীণ কপালে
মননের ভ্রূকুটি কুটিল।
সমাহিত শাঁজেলিজে, আরণ্যক বোয়া-দ্য-বুলোন্‌।
জলজমা, কাদা-ডোবা, থমথমে ঘন বন চিরে
সন্ত্রাসে পথ হাঁটে মন।
অমিতাভ গিরগিটি ধ্যান করে ঝুরিনামা ওক্‌-এর তলায়।
কালের কৃপণ-মুঠি খসা এক প্রবাল-প্রহর।
কঠিন নির্মোক-ভাঙা অন্তরঙ্গ পরিচয়ে উচ্চকিত হবে কি বনানী,
অনাত্মীয় হে হৃদয় মোর ?

তক্ষুনি ঝরঝরে রোদ ওঠে। ঝলমলে বন।
তির্যক কামনার গাণিতিক কশাঘাতে কাৎরায় মন ॥

কার্তিয়ে লাত্যাঁ

বুলভার সাঁ মিশেল্‌ নিঃসাড়ে ঘুমোয়।
তার্কিক ছাত্রের ভিড় ভেঙে গেছে রাত্রির হাওয়ায়

হালকা মেঘের মতো। পাঁথেয় নিথর।
একে-একে লুক্‌সাঁবুর্গে পরিশ্রান্ত পাতা ঝ'রে যায়।

গ্রীষ্মের উচ্ছ্বাস শেষ। এলো ক্লান্ত হেমন্তের রাত—
আবেগের ছাই মাখা মননের শাংকর প্রহর।
হিম পড়ে। পাতা ঝরে। ঝ'রে যায় অনেক শপথ।
গাঢ় ঘুমে পাশ ফেরে স্বপ্নালু শহর।

তারার আকুতি নেই—প্রলোভন কবোষ্ণ কাতর,
গ্ল্যাডিওলাসের ছন্দ অন্ধকার বন-বীথিকায়।
কোনো মুখ বুকে এসে দেবে না তো অলীক আশ্বাস :
তোমায় অমর ক'রে যাবো সপ্তশত গীতিকায়।

অবিশ্রান্ত পাতা ঝরে—অবলুপ্ত কবির লেখন,
চাঁদের আগুনে যারা সেঁকেছিল মন আর ক্ষয়িত শোণিত
প্রাচীন ফাল্গুনে কোনো, হয়তো বা এঁকে যেতে কোনো
মুখ কথার রেখায়—
শেখায় তাদের প্রেত হাতে ধ'রে কালের গণিত।

ঘুমে ভারী "বুল্‌ মিশ্‌"। নিরাশ্রয় মন
অর্থহীন পৃথিবীতে খুঁজে মরে যে-কোনো সংকেত।

হিমার্ত হৃদয় চায় পথপ্রান্তে পাতার উত্তাপ।
সোর্বনে প্রহর গোনে রিশ্‌লো-র প্রেত॥

ভাষ্য :—"কার্তিয়ে লার্তাঁ"—প্যারিসে ছাত্র-শিল্পী-বুদ্ধিজীবীদের নিরঙ্কুশ স্বরাজ্য।
"লুক্‌সাঁবুর্গ্‌" —বিখ্যাত পার্ক—বহু কবি-শিল্পীর প্রিয়।
"বুল্‌ মিশ্‌" —বুলভার সাঁ মিশেল্‌-এর আদুরে ডাকনাম।
"রিশলো" —কার্ডিনাল রিশলো, বর্তমান সোর্বন্‌-এর প্রতিষ্ঠাতা ; সোর্বনেই সমাধিস্থ।

নাম খোদাই

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

এই-যে ঘুমনিবিড় মাঠ, মুখরা এই নদী
আমাকে অনায়াসেই ভোলে যদি,
এখানে গত একুশে আশ্বিন
শীর্ণ এক টিলায় সারাদিন
বাটালি দিয়ে যত্নে গাঁথিলাম
ক্ষণপ্রাণ আমার ছোটো নাম।
এবারে এসে হঠাৎ দেখি নেই সে-নাম নেই,
শুকনো নদী ঢাকলো মুখ আমার সামনেই
রুগ্ন মাঠে ঘাসের হাটে নামের দাম নেই।

সহসা শুনি অনেক দূরে অনেক সাঁওতালি
মদের পর মাদলে মাতে খালি।
পা টিপে-টিপে সেখানে গিয়ে যখনি দাঁড়ালাম,
এগিয়ে এসে শুধালো : 'তোর নাম ?'
তাদের বুকে এ-নাম বুনে বলেছি : 'ভুলবিনে—'
আমাকে আমি ভুলেছি এই একুশে আশ্বিনে!

নিঃসঙ্গ

সরিৎ শর্মা

তখন মাঠের বুকে জ্যোৎস্নার ঝড়,
নদীর হাওয়ায় গান, বনের মর্মর,
নক্ষত্র মিছিল, নীল আকাশ ; শহর
ঝিমায় একটু দূরে, ঝিমায় ওপার!

তখন একান্তে ব'সে বন-জ্যোৎস্নায়,
গভীর মনন নিয়ে চোখের ছায়ায়—
ক্লান্ত মৃদু চাপা সুরে বলে সে আমায়—
'কী হবে এখানে বেঁচে, কী হবে আমার!'
(ঝিমায় শহর দূরে, ঝিমায় ওপার।)

মানে নেই, জীবনের কোনো মানে নেই ;
কী হবে বা খেতে সোনা-ফসল নিয়েই,
কী হবে বা পৃথিবীর কিছুটা জেনেই!
বেঁচে থাকা—এই এক ব্যাধি মনে হয়।

কোথাও তো প্রেম নেই ; ধূ-ধূ অবিশ্বাস!
বাতাসে সৌরভ নেই ; তৃণে দীর্ঘশ্বাস!
চাঁদের ধবল লেগে পৃথিবী আকাশ
ব্যাধিগ্রস্ত ; স্তব্ধ রাত ; মৃত্যু সুনিশ্চয়!
বেঁচে-থাকা, এই এক ব্যাধি মনে হয়!

বাদুড়ের চংক্রমণ গাছের মাথায়,
কোথাও কুকুর ডাকে, প্যাঁচা উড়ে যায়
কটু চিৎকারে ; সে-ও মুখ তুলে চায়—
তারপর কী বিষণ্ণ পা বাড়ায় ধীরে !

তখন মাঠের বুকে জ্যোৎস্নার ঝড়,
নদীর হাওয়ায় গান, ফুলের নিঝর,
নক্ষত্রের ভিড় নীল আকাশে, শহর
ঘুমায় সে কোন গানে কতো স্বপ্ন-নীড়ে ;
ঘুমায় ওপারে চর সুষমার তীরে।

ছুটি কবিতা

রাজলক্ষ্মী দেবী

প্রত্যাবর্তন

মধ্যদিনে ফিরে আসি। সঙ্গে এই রক্তাক্ত হৃদয়,
—ক্রূর উত্তরাধিকার। ফিরে নাও—তুমি দয়াময়।
আকাশবিহারী আশা—স্বপ্ন কতো ঘুমের পশ্চাতে—
তুমি তার কী বুঝেছো ? মন যে ঘিরেছে অনাস্থাতে।
হে ঈশ্বর, কথা দাও। কারো চোখে জ্বালাও আলোক,
আত্মা যাতে ধন্য হবে। মর্মদাহী তোমার পাবক,
তুমি এর মর্ম জানো। তুমি আনো ভাবগ্রাহী শ্রোতা।
হে ঈশ্বর, কী দিয়েছো ! আত্মা কাঁদে—বোঝে না জনতা।

ঘুমোতে পারি না কেন ? রাত জাগি, সূর্য জ্বলে চোখে।
চারদিক অন্ধকার, পুড়ে মরি নিজের আলোকে।
মধ্যদিনে ফিরে আসি, ব্যর্থ জীবনের ঋণ শুধে
হয়তো মিলিয়ে যাবো অন্তহীন প্রাণের বুদ্বুদে।

বুঝবে না, কী যে ক্ষতি !—আকাশে এখনো সূর্য হাসে,
এখনো ফুলের হাওয়া প্রসন্ন বিকেল নিয়ে আসে,
এখনো পৃথিবী ছিলো, শস্য ছিলো। তবু, উপবাসী
হৃদয়ের বোঝা ব'য়ে মধ্যদিনে আমি ফিরে আসি॥

বাড়ি

পূর্বপুরুষের বাড়ি কথা বলে। প্রত্যেক কোণায়
উদ্যত তর্জনী তোলে রক্তের সংস্কার। জ্যোৎস্নায়

জড়িয়ে-জড়িয়ে বাঁধে মনপ্রাণ প্রাচীন মায়ায়।
ফিসফিস শাসনের তাল তোলে আজব ছায়ায়।
আলো নিবে গেলে আমি একা। এই বাড়ি মুখোমুখি ;
পূর্বপুরুষেরা আসে—সুখে সুখী তারা, দুখে দুখী।
দীর্ঘদিন কেটে গেছে, সেই সব স্মৃতিকথা বলে
এ-বাড়ির কোণে-কোণে। সন্ধ্যায় সমস্ত আলো জ্বলে
একবার। তখন স্বপ্নেরা আসে, ঘরে-ঘরে মূর্তি হ'য়ে বসে।
বাড়ি তো নির্জন নেই—আছে, ঠিক যেমন ছিল সে।
আহা, তবু সন্ধ্যাদীপ হাতে নিয়ে যে যায় একাকী,
সেই বোঝে, কী শূন্যতা, কী বেদনা। সব স্বপ্ন, ফাঁকি।

অনুরাধার জন্যে

সঞ্জয় ভট্টাচার্য

তোমার ত চোখ খালি তৃণ
বাণ শুধু জল'
কাজলে করবে তারে কতো উচ্ছল—
কি ভাবে নিভাবে বলো জলের আগুন?

আলেয়া যে জ্বলে আর নেভে
তোমার তিমির তারে কতোটুকু দেবে
কতো কট্ আছে তমোগুণ—
অধরে কি অধরের পাবে পরিমল?
রাত্রিকে অরণ্য ভেবে
জোনাকিরা হবে নাকি কখনো অনল?

যৌবন যবনিকা থাক।
চকাচকি শুধু চোখাচোখি নির্বাক।
কার সাধ চাঁদ পেয়ে পাতাল অতল?
থাক রাস বসন্ত-বাস।
আর কেন রাঙা ফাঁকি অশোক-পলাশ
বধূ-লীলা কেন বারোমাস
দোল-ঝুলনের পালা, ফুলমালা, ফল?
ফিরে-ফিরে কেন অজ্ঞান-ফাল্গুন?

দিনের পর দিন

বুদ্ধদেব বসু

বৃষ্টির দিন

বৃষ্টি এলো, আবার বৃষ্টি! বৈশাখের রূপসী বৃষ্টি নয়, শ্রাবণের আদরে ভরা স্পর্শ নেই, হিম বৃষ্টি, কালো বৃষ্টি, হেমন্তের শীত-নামানো বৃষ্টি।

আ, এই ভালো, এই আমার ভালো লাগে! আশ্বিনের উজ্জ্বল দিনগুলি তাদের হিরের দাঁত দেখিয়ে ব'লে গেছে আমাকে, 'ওরে প্রক্ষিপ্ত মানবক, বিশ্বের অপলাপ, চেয়ে ছাখ আমাদের দিকে—কী সুন্দর আমরা, কী নির্মল, নির্মম, উদাসীন!' তাদের আলোর ধারে ছিঁড়ে গেছি আমি, তাদের ব্যঙ্গের ভারে অবসন্ন।

সান্ত্বনা নিয়ে এলো এই দিন, এই নুয়ে-পড়া, বুজে-আসা, নিরবয়ব দিন। ঘণ্টা মুছে গেছে, সময়ের ক্রূর কামড় আজ আর সইতে হবে না আমাকে—কিছুক্ষণ, অন্তত কিছুক্ষণ ছুটি! সকাল মিশে যাবে দুপুরে, দুপুর মিলিয়ে যাবে বিকেলে—চিহ্ন নেই, গয়না নেই, অস্ত্র নেই—একটানা, একাকার, ধূসর।

আজ আকাশ ভ'রে মেঘ ছড়িয়ে পড়েছে আমারই আত্মার কালিমার মতো, আর এই রূঢ় বৃষ্টির তলায় কলকাতা প'ড়ে আছে যেন কামুক স্বামীর ভারপিষ্ট কোনো নির্বোধ নিঃসাড় ক্লান্ত সহিষ্ণু প্রৌঢ় রমণী।

আমি ব'সে আছি জানলায়; অন্ধকার মেঘের দিকে তাকিয়ে-তাকিয়ে অনন্তকালের মধ্যে ডুবিয়ে দিচ্ছি আমার মনস্তাপ—তিক্ত স্মৃতি, দুরন্ত অনুশোচনা, আমার নিঃশব্দ, নিঃসঙ্গ চীৎকার।

এদিকে মানুষের সংসারে বেলা বাড়ে; কেউ দোকান খুলে বসে, কেউ ফেরে বাজার থেকে, আর একে-একে ট্রামের স্টপে

লোকেরা এসে দাঁড়ায়—ছাতা নিয়ে, বর্ষাতি নিয়ে, বেঁচে থাকার গম্ভীর প্রতিজ্ঞা নিয়ে, ভুলে থাকার উদার আশ্বাসে মজ্জমান।

কী ভুলতে চায়? বেঁচে আছে, তা-ই ভুলতে চায়।

শুনছো না বৃষ্টির শব্দে আকাশ ভ'রে ঘোষণা উঠছে—'পালাও! আপিশে, ফ্যাক্টরিতে, ফটকাবাজারে, রাজনীতির উত্তেজনায়—যেখানে হয়, পালাও! আর যখন সন্ধের পর আর-কিছুই থাকবে না, তখন মদ, তখন জুয়ো, তখন গণিকার পরিশ্রমী আলিঙ্গন। যেখানে হোক, যে ক'রে হোক—পালাও, দুর্ভাগা জীব, লুকিয়ে রাখো তোমার চেতনার অভিসম্পাত, ডুবিয়ে দাও দিনের পর দিনের এই আবর্তন—এই হত্যাকারী আবর্তন! কেননা মৃত্যু দুঃখের নয়, তুমি যে মরছো সেটা জানতে পাওয়াই যন্ত্রণা।'

রাত্রি

রাত্রি, প্রেয়সী আমার, প্রসন্ন হও, নিদ্রা দিয়ো না।

তোমার মনে আছে, রাত্রি, আমাদের মিলনের অনুষ্ঠান? সেই নগ্নতার শপথ, স্তব্ধতার শপথ, যৌতুকের বিনিময়?

তুমি আমাকে দিয়েছিলে তোমার চাঁদ, অনেক চাঁদ, আরো অনেক তারা, তারা-ভরা আকাশ, জ্বলন্ত, আগুনের নিশ্বাস-ফেলা অন্ধকার। আর বিশাল দেশ, মহাদেশ, জনতাময় নির্জনতা, আর অনিদ্রার তীব্রমধুর উন্মাদনা।

আর আমি তোমাকে দিয়েছিলাম আমার প্রেম, আমার প্রাণ, আমার আত্মার নির্যাস, সত্তার সৌরভ।

দিন, তোমার বোন, তোমার সতিন, সে তার কাঁকন-পরা মোটা হাতে বাধ্য করেছে আমাকে, নিয়ে গেছে টেনে তার অলিতে-গলিতে,

আঁচলে বাঁধা চাবির গোছা বাজিয়ে-বাজিয়ে। ব্যস্ত সে, অঢেল রৌদ্র নিয়েও অস্পষ্ট; এলোমেলো, ছেঁড়াখোঁড়া, আকৃতিহীন; তার মুহূর্তগুলি শিষের মতো বোবা শব্দে ফুটপাতে খ'সে পড়ে, তার ঘণ্টার টুকরোগুলোকে জোড়া দিয়ে আর-কিছুই পাওয়া যায় না—শুধু খিদে পাওয়ার দীনতা, খেতে পাওয়ার হীনতা, শুধু ইতর সুখ, বামন দুঃখ।

এই দিন আমি মেনে নিয়েছি, সহ্য করেছি, বকলশ-আঁটা কুকুরের মতো ঘুরেছি তার পিছনে—তোমার জন্য, তোমারই জন্য, রাত্রি! আ, সেই মুহূর্ত, যখন, দিনের মুঠো শিথিল, রাবণ ভিড় নিবৃত্ত, আমি আবার খুঁজে পেয়েছি তোমাকে, নগ্ন হ'য়ে, শুদ্ধ হ'য়ে, তোমার কালো চুলের অতল নীল তরঙ্গে-তরঙ্গে স্নান ক'রে বলতে পেরেছি—'আমি আছি!'

তুমি আমাকে দিয়েছো তোমার চাঁদ, অনেক চাঁদ—ম'রে-যাওয়া, ফিরে-আসা চাঁদ, আর নক্ষত্রের নিশ্বাস-ফেলা অন্ধকার! আর আমি তোমাকে দিয়েছি আমার প্রাণ, আমার মন, আমার চেতন সত্তা নিংড়ে-নিংড়ে পূর্ণ করেছি চুম্বনের পাত্র।

মনে আছে?

আমি খেলা করেছি তোমার চাঁদ নিয়ে, যেমন শুয়ে-শুয়ে কানের দুলের মুক্তো গোনে প্রেমিক, তোমার বাঁকা চাঁদ, রোগা, ঝোলা, চ্যাপ্টা চাঁদ, শাদা, সবুজ, হলদে, উর্বশীর রূপের মতো নির্লজ্জ, ভাঙা কাচের দাঁতের মতো শীতের চাঁদ, ঈশ্বরের ক্ষমার মতো দিগন্তে। দুই হাতে ছেনেছি তোমার অন্ধকার, উঠেছি তার ধাপে-ধাপে বেয়ে, নেমেছি তার আনন্দময় ঢালু দিয়ে গড়িয়ে, তার নরম, রোমশ, অফুরন্ত ভাঁজে-ভাঁজে জড়িয়ে গিয়েছি, তোমার বিশাল, তরল আলিঙ্গনে লীন হ'তে-হ'তে বুঝেছি যে

নক্ষত্রেরা আর-কিছু নয়, তামসীর চিন্ময় রূপ—যখনই তুমি চিন্তা করো, তখনই আকাশে তারা ফোটে, মনস্বিনী!

আর আমিও চেয়েছি আমার চিন্তা আলো হ'য়ে ফুটুক, তারা হ'য়ে জ্বলুক, শাদা, সবুজ, সোনালি তারা, বরফের চোখের মতো ধারালো, দেবতার অশ্রুর মতো দিগন্তে। আর যখন, তোমার সেই পূর্ণতার প্রহরে, যখন কবি, দুঃখী, চোর ছাড়া আর-কেউ জেগে থাকে না, আমার আশার অশ্ববেগ আমাকেই মাড়িয়ে গেছে খুরের তলায়, তখন তোমার ফুলে-ফুলে-ওঠা বুকের মধ্যে থরথর ক'রে কেঁপেছি আমি, বলেছি তোমার কানে-কানে আমার আকুল দুঃখ, পাগল বাসনা, বাসনার ব্যর্থতা—তোমারই কানে-কানে, প্রিয়তমা!

তুমি আমাকে সান্ত্বনা দাওনি—হীন সান্ত্বনা দাওনি; শুধু তোমার গুঞ্জনময় স্তব্ধতার সুরে বলেছো, 'এই নাও, এই বিশাল দেশ, বিশাল নির্জন, একে জনতাকীর্ণ ক'রে তোলো তোমার রক্ত দিয়ে, চিন্তা দিয়ে, স্বপ্ন দিয়ে!'

আমার বাসনা, আমার পরাজয়, আমার দুঃখের ঐশ্বর্য, তার বদলে এই তুমি দিয়েছো আমাকে—এই সবীজ দেশ, নির্জন দেশ, আর অনিদ্রার উন্মাদনা।

সব ভুলে গেছো?

না, না, আমি জানি তোমাকে, ছলনাময়ী, তুমি অসতী হ'য়ে জাগিয়ে দিলে আমার পৌরুষ, আমাকে পরিত্যাগ ক'রে জ্বালিয়ে দিলে তৃষ্ণা। একদিন তুমি নিজেই ধরা দিয়েছিলে আমাকে, আজ তোমার এই পণ যে আমি তোমাকে জয় করবো, রাক্ষসী মৃত্যুকে মেরে জয় ক'রে নেবো তোমাকে, অজরা। আর যেহেতু আমার কথা ছাড়া অস্ত্র নেই, গান ছাড়া সৈন্য নেই, তাই কথার ইস্পাতে শান দিয়ে-দিয়ে এই গান আজ বানালাম—ফিরে এসো,

রাত্রি, নেমে এসো এই মৃত্যুর উপর, আনো তোমার বুক ভ'রে আমার যন্ত্রণা—স্বপ্ন দাও, দুঃস্বপ্ন দাও, দাও ঈশ্বরের মতো কবির নিঃসঙ্গতা, কিংবা জ্বরের প্রলাপের আনন্দ—তোমার চিরযৌবনের যে-কোনো একটি চিহ্ন দাও আমাকে—শুধু নিদ্রা দিয়ো না, নিদ্রা দিয়ো না। আমাকে বাঁচতে দাও তোমার মধ্যে, তোমার নীল, কুটিল শিরায়-শিরায় আমি যেন ছড়িয়ে যাই আকাশ ভ'রে, তোমার চাঁদের ভাঙা-গড়ার স্পর্শ নিয়ে রঙিন হ'য়ে উঠি, স্পন্দিত হই নক্ষত্রের নিশ্বাসে;—আর যখন, আমাদের প্রণয়ের তাপ সইতে না-পেরে হিংসুক দিন দিগন্তকে ডিমের মতো ফাটিয়ে দেয়, তখন তোমার বুজে-আসা চোখের—তোমারই রহস্যের অপরিমাণ উজ্জ্বল ভারে বুজে-আসা চোখের—সর্বশেষ পলকপাতে আমি যেন চিরন্তনকে পান করতে পারি—এক মুহূর্তে, নিঃশেষে।

অন্তঃসার

অন্নদাশঙ্কর রায়

জীবন যেন একটা বহতা নদী আর আমরা শিল্পীরা যেন তাতে ডুব দিয়ে যে যার গাগরী ভরিয়ে ঘরে ফিরি। যে যার গাগরী উপুড় করে বলি, আমার কিছু দেবার ছিল, যা একান্ত আমারই। কথাটা মিথ্যা নয়, কেননা ডুব তো আমি সত্যই দিয়েছি, গাগরী আমি সত্যই ভরিয়েছি। অথচ যাতে ডুব দিয়েছি, যার জল দিয়ে গাগরী ভরিয়েছি তা আমার নয়, তা নিখিল বিশ্বের নিত্য প্রবাহিত জীবনযমুনা। যে রস আমি দিয়ে যাচ্ছি সেও কি আমার! হায়! আমার বলতে ঐ গাগরীটি। ঐ মানবহৃদয়টি।

শিল্পীর হৃদয় ভরে রয়েছে জীবনের কাছে পাওয়া কটুতিক্ত অম্লমধুর নানা অব্যক্ত অভিজ্ঞতায়। তার লেখনী বা তুলি বা সেতার দিয়ে সে ব্যক্ত করতে চাইছে সেই বিচিত্র অভিজ্ঞতা। ব্যক্ত করতে পারলেই হালকা হয় তার হৃদয়। তার পর তার হৃদয়ের রস কয় অপরের, হয় সকলের। ব্যক্ত করতে করতে ছড়িয়ে দিতে দিতে যা একের অন্তর হতে অন্যের অন্তরে উপনীত হয় আর্টের অন্তঃসার সেই জীবনযমুনার জল, সেই হৃদয়গাগরীর রস। যার নাম জীবনের সত্য সেই হয় হৃদয়ের সত্য। সেই সত্যই ব্যক্ত হতে হতে রূপান্তরিত হয়ে যায়, তখন তাকে বলি আর্টের সত্য। জীবন থেকে হৃদয়ে, হৃদয় থেকে হৃদয়ান্তরে তার যাত্রা। এই যাত্রা যেখানে শেষ হয়েছে সেখানে আর্ট অস্তিত্ব পেয়েছে।

জীবনের সত্য কি আর্টের সত্য? হাঁ এবং না। 'হাঁ' এইজন্যে যে গোড়ায় ওটা একই বস্তু। 'না' এইজন্যে যে মাঝখানে আছে

মানবহৃদয়। হৃদয়ের ভিতর দিয়ে না গেলে জীবনের সত্য আর্টের সত্য হয় না। হতে পারে বিজ্ঞানের সত্য, দর্শনের সত্য। কিন্তু আর্টের সত্য হৃদয়নিরপেক্ষ নয়। ঐ যে গাগরীটি ওটি না থাকলে নাগরী হয় না। জীবনযমুনার জল আনতে হয় নাগরীকে, গাগরী ভরিয়ে। শিল্পীকে হৃদয় ভরিয়ে। হৃদয় না থাকলে শিল্পী হয় না।

হৃদয় যেন মধুচক্র। সেখানে সঞ্চিত হয় নানা ফুলের মধু। কিন্তু তোমার সঞ্চিত মধুর আস্বাদ যদি আর কেউ না পায় তা হলে তোমার মধুসঞ্চয় কোনো দিন আর্টের পর্যায়ে উঠবে না। হৃদয় না থাকলে শিল্পী হয় না। কিন্তু হৃদয় থাকলেও শিল্পী হয় না, যদি না তার সঙ্গে থাকে উজাড় করে বিলিয়ে দেবার ইচ্ছা ও ক্ষমতা ও কৌশল। যাতে শিল্পীর সঞ্চয় রসিকের উপভোগ্য হয়। রসের সঙ্গে রূপ যোগ করতে পারলে তবেই রসিকজন উপভোগ করেন, রূপভোগ করেন।

রস যখন রূপায়িত হয়, রূপান্তরিত হয় তখনি তা আস্বাদনযোগ্য হয়। তখনি তা হয় কাব্য বা সংগীত, চিত্র বা অভিনয়। রস বলতে বুঝি হৃদয়রস, কিন্তু তার পূর্বে সেটা জীবনযমুনার জল। হৃদয়রস যদি হয় মানবহৃদয়ের অভিজ্ঞতা তবে জীবনযমুনার জল হবে রিয়ালিটি, মানবহৃদয়কে যে ভরে দিচ্ছে অভিজ্ঞতায়। অভিজ্ঞতার পূর্বে সেটা রিয়ালিটির খণ্ড। শিল্পের মূলে আছে রিয়ালিটি, মাঝখানে রিয়ালিটির অভিজ্ঞতা, উপরের দিকে অভিজ্ঞতার রূপায়য় বা রূপান্তর। ফুল সকলে দেখতে পায়, কিন্তু মূল দেখতে যায় ক'জন! আর কাণ্ড—তাই বা ক'জন দেখতে চায়! শিল্প শেখানোর জন্যে যে-সব স্কুল কলেজ হয়েছে সেখানে রিয়ালিটির খোঁজখবর কেউ রাখে না, মানবহৃদয়ের নাড়ীনক্ষত্র জানে না, কলাবিদ্যাই সেখানকার একমাত্র পাঠ। সেখান থেকে উত্তরে

আসা রীতিনিপুণদের কাছে বিশ্বরহস্য বা হৃদয়রহস্য একটা কথার কথা। একমাত্র সত্য হচ্ছে রূপ।

কিন্তু কিসের রূপ? রূপের পশ্চাতে কী আছে? অভ্যন্তরে কী আছে? এর উত্তরে কেউ বলবে, কিছুই নেই, না থাকলেও চলে। কেউ বলবে, আছে একটা না একটা বিষয়, কিন্তু সেটা ইন্দ্রিয়ের গোচর, তার সঙ্গে হৃদয়ের কী সম্পর্ক তা জানিনে। চোখ দিয়ে দেখেছি, হৃদয় দিয়ে দেখিনি, কান দিয়ে শুনেছি, প্রাণ দিয়ে শুনিনি, হাত দিয়ে ছুঁয়েছি, চেতনা দিয়ে ছুঁইনি। দরকার আছে বলে মনে হয়নি।

রূপভোগ যে কেন রসভোগ নয় তার কারণ নিহিত রয়েছে এই সব উত্তরে। আর্ট বলে সাধারণত যার পরিচয় তার রূপ আছে, কিন্তু সৌন্দর্য নেই। সৌন্দর্য অনেক গভীর স্তরের ব্যাপার। মানবহৃদয়ের গাগরী কাঁখে নিয়ে জীবনযমুনার সলিলে অবতরণ করলে, অবগাহন করলে, নিমগ্ন হলে তবেই তুমি তার সন্ধান পাবে। আগে সন্ধান পেলে পরে সন্ধান দেবে। তখন তোমার রূপসৃষ্টি হবে সৌন্দর্যসৃষ্টি। সত্যই সৌন্দর্য, সৌন্দর্যই সত্য, কবি কীটসের এই আপ্ত বাক্য তখন অর্থবান হবে।

আর্টের অন্তঃসার তা হলে জীবনের সত্য, জীবনের সৌন্দর্য। তোমার অন্তরের অন্তঃসারও তাই। তোমার অন্তরের অন্তঃসার হয়েই তা আর্টের অন্তঃসার। আর্টের প্রতিষ্ঠা সত্যের শৈলের উপরে। অতি কঠোর ভিত্তি। অতি সুদৃঢ় ভিত্তি। তবে মানব-হৃদয়ের নরম মাটি ও কচি ঘাসপাতা দিয়ে ঢাকা। সত্যিকারের আর্ট কখনো অসত্য হতে পারে না। তবে মানুষের সুখ দুঃখ তাকে রসাল করে। তার পর সেই রসাল সত্যকে রূপান্তরিত করে কলাবিতের কলাবিদ্যা, মায়াবীর মায়াদণ্ড। সত্যের অঙ্গে মায়া

মাখানো হয়। তখন তাকে মায়া বলে ভ্রম জন্মায়। তবু আসলে সে সত্যই। সত্যই আর্টের অন্তঃসার। আর্ট দাঁড়িয়ে থাকে সত্যের জোরে। এবং সত্যের জোর হচ্ছে সৌন্দর্যের শক্তি। সত্যই সৌন্দর্য, সৌন্দর্যই সত্য। এখানে যে সৌন্দর্যের কথা হচ্ছে তা শিল্পীর সৃষ্ট নয়, তা শিল্পীর দৃষ্ট।

কিন্তু এ কথাও ঠিক যে সত্যকে বা সৌন্দর্যকে আমরা শিল্পীরা যেমনটি দেখি তেমনিটি দেখাইনে। কারণ আমরা তো কেবল দ্রষ্টা নই, আমরা স্রষ্টা। স্রষ্টা মাত্রেরই অধিকার আছে সৃষ্টিকে তার মনোমতো করবার। মনোমতো না হলে ভেঙে চুরমার করবার। বিশ্বস্রষ্টা প্রতি নিয়ত এই কর্ম করছেন। আমরাও করে থাকি। একটি গল্প বা একখানি উপন্যাস শেষ পর্যন্ত যে আকার নেয় তা আমাদের নিজেদেরই স্বপ্নাতীত। জানার সঙ্গে অজানাকে মিলিয়ে, ঘটনার সঙ্গে কল্পনাকে জুড়ে, কত বাদসাদ দিয়ে, কত অদল বদল করে অবশেষে যা গড়ে তুলি তা জীবনের মতো নয়, তা মনের মতো। হয়তো মনের মতোও নয়, নিজের মতো। গল্প তার নিজের নিয়মে চলে, লেখকের শাসন মানে না, এমনও তো দেখেছি। সেই অবাধ্য ঘোড়ার পিঠে চড়লে সে যে কোন তেপান্তরের মাঠে নিয়ে যায়, কোন খালে বিলে কন্দরে, তা সেই জানে। স্রষ্টার অধিকার খাটাতে গিয়ে দেখি সৃষ্টির স্বকীয় একটা অধিকার আছে, বেশী রাশ টানতে পারিনে। বিশ্বস্রষ্টার দশাটাও বোধ করি আমাদেরই মতো।

মোটের উপর যা হয়ে ওঠে তার সমস্ত স্খলন পতন সত্ত্বেও স্থিতি সত্যের উপর। সত্যের অভিজ্ঞতার উপর। সেইজন্যে সে বিশ্বসৃষ্টির সঙ্গে তুলনীয়। শুধু তাই নয়, সে বিশ্বসৃষ্টির অঙ্গ। তাকে ছেড়ে বিশ্বসৃষ্টি নয়। আমরা যখন সত্যিকারের শিল্প সৃষ্টি

করি তখন বিধাতার সঙ্গে যোগ দিয়ে বিশ্বসৃষ্টি করি। বিধাতার সৃষ্টি যদি নিরর্থক না হয় আমাদের সৃষ্টিও নিরর্থক নয়। এর সার্থকতা এর অন্তর্গূঢ় সত্যে। সত্যের সাক্ষাৎকার যদি না পেয়ে থাকি তবে অবশ্য অন্য কথা। তা হলে ব্যর্থতা ঢাকবার উপায় নেই। কানা চোখ চশমায় ঢাকলে কী হবে! হলোই বা সোনার চশমা। সৃষ্টি সেখানে অনাসৃষ্টি। কারণ অন্তঃসারশূন্য। আর্টের চরম বিচার তার অন্তঃসার দিয়ে। রূপ বা রীতি দিয়ে নয়। আর্ট যেন এক প্রকার সাক্ষ্য। সাক্ষ্য যদি সত্য না হয় তবে বিচারক তাকে নাকচ করেন।

কিন্তু আমাদের সত্য আদালতের সত্য নয়। জীবনের তথা হৃদয়ের সত্য। এর বয়ানের ধারাও এক রকম নয়। এর প্রতি অঙ্গে মায়া মাখানো। সেইজন্যে একে মিথ্যা বলে মনে হতে পারে। শিল্পীকে সামাজিক কাঠগড়ায় দাঁড় করালে তার মুখ দিয়ে যা বেরিয়ে আসে তা নিরেট বাস্তব নয়, মায়াময় রসাল সত্য। সংসারী লোকের শুনে ধাঁধা লাগে। তারা বুঝতে না পেরে মাথা নাড়ে আর বলে, রবি ঠাকুর হেঁয়ালি লিখেছেন।

সত্যের বিচার ওভাবে হয় না। হয় সহজ বোধ দিয়ে। ঘণ্টা যেমন বাজে সত্যও তেমনি। কথাটা কি সত্যের মতো বাজছে? যদি সত্যের মতো বাজে তাহলে ওটা সত্যই। গল্পটা কি সত্যের মতো বাজছে? না, বাজছে না। তাহলে ওটা সত্য নয়। অনেক জাগতিক ঘটনা সত্যের মতো বাজে না, যদিও লোকের চোখে দেখা। আবার কাল্পনিক ঘটনাও সত্যের মতো বাজে। যদিও কেউ চোখে দেখেনি। মানুষের চোখের আড়ালেও কত কী ঘটছে, ভিতরে ভিতরে মন দেওয়া নেওয়া হয়ে যাচ্ছে, একজন আরেক-জনকে টানছে, কিম্বা ঠেলছে, দূরে সরে যাচ্ছে বা সরিয়ে দিচ্ছে,

এসবের সত্যতা কি চোখে দেখা ঘটনার চেয়ে কম? লোকে হয়তো বোঝে না, সরল করে বোঝানোও যায় না, পাঠকের ও লেখকের উভয়ের অক্ষমতার দরুণ সত্যের প্রতি সংশয় জাগে।

সত্যকে উপলব্ধি করতে হয়। যে লিখবে সেও উপলব্ধি করবে। যে পড়বে সেও। উপলব্ধির অভাব আর কিছু দিয়ে ভরে না। এর জন্যে ডুব দিতে হয় জীবনযমুনায়। সেটা একটা কাটা খাল নয় যে তোমার ইচ্ছা খাটবে তার উপর। কোথায় যে তার আদি তা কেউ বলতে পারে না, কোথায় যে তার অন্ত তাও কেউ জানে না। কবিত্ব করে যমুনা বলেছি বটে, কিন্তু জীবনের দিকে তাকাতে ভয় করে। ডুব দিতে গিয়ে কত লোক তলিয়ে গেছে অতলে। জীবন একেবারেই সহজ ব্যাপার নয়, তার পদে পদে দুঃখ দৈন্য দ্বন্দ্ব। পদে পদে স্নেহ প্রীতি করুণাও আছে। নইলে চলা কবে থেমে যেত। মানুষের চলার কথা বলছি। জীবনের চলা কি থামতে পারে! জীবন নিত্য চলমান। মানুষ না থাকলেও সে চলত, না থাকলেও চলবে। মানুষকে বাদ দিয়ে ভাবলে দুঃখ দৈন্য স্নেহ প্রীতি ইত্যাদির অর্থ হয় না। মানুষিক ভাবনার ঊর্ধ্বে উঠলে এ সকলের প্রকৃত অর্থ জানা যায়। কিন্তু এ কাজ শিল্পীর নয়, দার্শনিকের। তবে যে শিল্পী সে দার্শনিকও হতে পারে, তার শিল্প সৃষ্টির সঙ্গে তার বিশ্ব দৃষ্টি একাকার হতে পারে। বড় বড় কবির বেলা এ রকম ঘটেছে। দান্তে, গ্যেটে, রবীন্দ্রনাথের বেলা।

রূপালি স্নান

শামসুর রাহমান

শুধু দু'টুকরো শুকনো রুটির নিরিবিলি ভোজ
অথবা প্রখর ধূ ধূ পিপাসার আঁজলভরানো পানীয়ের খোঁজ
শান্ত সোনালি আল্পনাময় অপরাহ্নের কাছে এসে রোজ
চাইনি তো আমি। দৈনন্দিন পৃথিবীর পথে চাইনি শুধুই
শুকনো রুটির টক স্বাদ আর তৃষ্ণার জল। এখনো যে শুই
ভীরু-খরগোশ-ব্যবহৃত ঘাসে, বিকেলবেলার কাঠবিড়ালিকে
দেখি ছায়া নিয়ে শরীরে ছড়ায়, সন্ধ্যানদীর আঁকাবাঁকা জলে
মেঠো চাঁদ লিখে
রেখে যায় কোনো গভীর পাঁচালি—দেখি চোখ ভ'রে;
ঝিঁঝিঁর কোরাসে স্তব্ধ, বিগত রাত মনে ক'রে
উন্মন-মনে হরিণের মতো দাঁতে ছিঁড়ি ঘাস,
হাজার যুগের তারার উৎস ঐ যে আকাশ
তাকে ডেকে আনি হৃদয়ের কাছে, সোনালি অলস মৌমাছিদের
পাখা-গুঞ্জনে জ্ব'লে ওঠে মন, হাজার-হাজার বছরের ঢের
পুরোনো প্রেমের কবিতার রোদে পিঠ দিয়ে বসি, প্রগাঢ় মদের
চঞ্চলা সেই রসে-টুপটুপ নর্তকী তার নাচের নূপুর
বাজায় হৃদয়ে মদির শব্দে, ভ'রে ওঠে সুরে শূন্য দুপুর
এখনো যে এই আমার রাজ্যে—এইটুকু ছিল গাঢ় প্রার্থনা—
ঈশ্বর! যদি নেকড়ের পাল দরজার কোণে ভিড় ক'রে আসে,—
এইটুকু ছিল গাঢ় প্রার্থনা—তবুও কখনো ভুলব না, ভুলব না।

ভাবিনি শুধুই পৃথিবীর বহু জলে রেখা এঁকে
চোখের অতল হ্রদের আভায় ধূপছায়া মেখে
গোধূলির রঙে একদিন শেষে খুঁজে নিতে হবে ঘাসের শয্যা!
ছন্দে ও মিলে কথা বানানোর আরক্ত কতো তীক্ষ্ণ লজ্জা
দৃষ্টিতে পুষে হাঁটি মানুষের ধূসর মেলায়!
চোখ ঠেরে কেউ চ'লে যায় দূরে, কেউ সুনিপুণ গভীর হেলায়
মোমের মতন চকচকে সুখী মুখ তুলে বলে এঁকে-বেঁকে, 'ইশ,
দিনরাত্তির মধুভুক সেজে পদ্য বানায়, ওহো, কী রাবিশ!'
আকাশের নীচে তুড়ি দিয়ে ওরা মারে কতো রাজা, অলীক উজির
হেসে-খেলে রোজ। তবু সান্ত্বনা: আকাশ পাঠায় স্বর্গ-শিশির,
জোনাকি-মেয়েরা বিন্দু-বিন্দু আলোর নূপুরে ভ'রে দেয় মাঠ
গাঢ় রাত্তিরে বিষণ্ণ সুরে: তোমার রাজ্যে একা-একা হাঁটি,
আমি সম্রাট!

শিশিরের জলে স্নান ক'রে মন তুমি কি জানতে
বিবর্ণ বহু দুপুরের রেখা মুছে ফেলে দিয়ে
চ'লে যাবে এই পৃথিবীর কোনো রূপালি প্রান্তে?
নোনাধরা মৃত ফ্যাকাশে দেয়ালে প্রেতছায়া দেখে, আসন্ন ভোরে
দু'টুকরো রুটি
না-পাওয়ার ভয়ে শীতের রাতেও এক-গা ঘুমেই বিবর্ণ হই,
কোনো একদিন গাঢ় উল্লাসে ছিঁড়ে খাবে টুঁটি
হয়তো হিংস্র নেকড়ের পাল, তবু তুলে দিয়ে দরজায় খিল
সস্তাসুর্যে যেসাসের ক্ষমা মেখে নিয়ে শুধু গড়ি উজ্জ্বল কথার মিছিল।

হয়তো কখনো আমার ঠাণ্ডা মৃতদেহ ফের খুঁজে পাবে কেউ
শহরের কোনো নর্দমাতেই;—সেখানে নোংরা, পিছল জলের
অগুনতি ঢেউ
খাবো কিছুকাল। যদিও আমার দরজার কোণে অনেক বেনামি
প্রেত ঠোঁট চাটে সন্ধ্যায়, তবু শান্ত রূপালি স্বর্গশিশিরে স্নান
করি আমি।

বুদ্ধদেব বসুর কবিতা : 'দ্রৌপদীর শাড়ি'

রমেন্দ্রকুমার আচার্যচৌধুরী

বুদ্ধদেব বসুর সর্বাধুনিক কাব্যগ্রন্থ 'দ্রৌপদীর শাড়ি'তে এই পুরোনো কথাই নতুন ক'রে প্রমাণ হ'লো যে, একান্তভাবে ঐতিহ্যসংগত হ'য়েও কবিতা গতানুগতিক না-ও হ'তে পারে, ঐতিহ্যের সঙ্গে কবিত্বের বিরোধের সম্ভাবনা আসলে নিতান্তই কাল্পনিক।

কেননা, 'দ্রৌপদীর শাড়ি'র অনেক কবিতাই রাবীন্দ্রিক স্মৃতি-সৌগন্ধ্যে উন্মনা। অথচ, সুস্পষ্ট রবীন্দ্র-সংক্রমণ সত্ত্বেও প্রত্যেক রচনাই মৌলিক। সেই আশ্চর্য মধুর, মোহময়, অবিস্মরণীয় সুরকে অস্বীকার না ক'রে—তাকে আশ্রয় ক'রেই—বুদ্ধদেব নতুন ও বিচিত্র এক সুরের জন্ম দিতে চেষ্টা করেছেন। এবং এ-বইকে সম্মুখে রেখে, 'রবীন্দ্রনাথের সুর একবার যার মর্মে প্রবেশ করেছে চিরদিনের মতো অন্য মানুষ হ'য়ে গেছে সে', মাইকেল প্রসঙ্গে বুদ্ধদেবের এই উক্তি আত্মজীবনী ব'লেই মনে হয়। অথচ এই কবিই যৌবনে বাংলার সারস্বত সমাজের 'ভয়ানক শিশু' (infant terrible) ছিলেন, এবং একদা কোনো এক সাহিত্যসভায় 'রবীন্দ্রযুগ গত হয়েছে' এই চরম মন্তব্য ক'রে বাংলা সাহিত্যের পায়রার খোপে কী আলোড়নই না সৃষ্টি করেছিলেন। "High-flying Buddha Bose" এই ব'লে সেদিনের অমৃতবাজার পত্রিকা তাঁকে সম্মানিত করেছিল।

আমরা মনের অবচেতনের তিমিরে
কত যে কথার জোনাকি
লাজুক আলোকে খুঁজে-খুঁজে ফেরে তোমারে—
শ্রাবণ, তুমি তা জানো কি ?

("শ্রাবণ")

উদ্ধৃত অংশের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের নিশ্চয়ই সুস্পষ্ট ঘনিষ্ঠতা। কিন্তু, এতৎ-সত্ত্বেও, যে-কোনো বিচারী পাঠক অবশ্যই স্বীকার করবেন যে, আপাতদৃষ্টিতে

চমকপ্রদ নতুন না হলেও এরি মধ্যে অনাস্বাদিতপূর্ব এমন কিছু আছে যার জন্য আমাদের কান ও মন এক অপূর্ব তৃপ্তিতে ভ'রে যায়।

প্রথমত, 'অবচেতনে'র মতো একটি বৃহৎ বৈজ্ঞানিক পরিভাষাকে বুদ্ধদেব অবলীলাক্রমে বসিয়ে গেছেন তিন মাত্রার ছন্দে, অথচ কথাটি তার রঙিন প্রতিবেশীদের সঙ্গে এমনভাবে মিশে গিয়েছে যে ও-শব্দটি যে পারিভাষিক এ-কথা আমাদের একবারও মনে হয় না। তা ছাড়া, 'জোনাকি'র সঙ্গে 'জানো কি' বা 'তিমিরে'-র সঙ্গে 'তোমারে'-র মিলও কম চতুর ও মধুর হয় নি : একস্বরের মিল যে মাধুর্যে ও বিস্ময়ে কখনো-কখনো যুগ্মস্বরের মিলকেও ছাড়িয়ে যায়, যাঁরা একস্বরের মিলকে অশ্রদ্ধেয় ব'লে মনে করেন তাঁদের কাছে এ নিশ্চয়ই এক নতুন আবিষ্কার। এ-ছাড়াও, 'দ্রৌপদীর শাড়ি'র "রহস্য" কবিতায় জাদুকর অর্ধমিলের টেক্কাকে মিলের ছুরির সঙ্গে এমনভাবে সুকৌশলে চালিয়ে দিয়েছেন যে কবিতাটি পড়বার সময় আবিষ্ট পাঠকের পক্ষে তাঁর এই আশ্চর্য হাত-সাফাই ধরতে পাওয়া যথার্থই কঠিন। এমনি অসামান্য কারুকর্মের পরিচয় এ-বইয়ের যে-কোনো কবিতাতেই মিলবে—'যে-কোনো' কথাটি এখানে অর্থহীন অতিরঞ্জন নয় : অনুপ্রাস, মিল ও ছন্দের অভাবিত বিচিত্রতা, স্বর ও ব্যঞ্জনের সুচতুর বিন্যাস ('সে-আকুল আশি বছরের কারুকলা'), সুর ও চিত্রের নিপুণ সংযোজন ('গাছের সবুজে রোদের হলুদে গলাগলি'), দু-একটি অপূর্ব শব্দৌচিত্যের উদাহরণ ('গাছের গায়ে আছাড় দেয় হাওয়ার হিজিবিজি'), স্তবকের সুচারু স্বকীয়তা, চিত্র, চিত্রকল্প ও শব্দবন্ধের সজীব, উষ্ণ উপস্থিতি, 'রোদ্দুরের আঙুলে আঁকা মেঘের চেরা সিঁথি', 'অচন্দ্রচেতন যুবা', 'আহ্লাদি-লাল')।

সত্য, অবিরল মহার্ঘতায়, পুনরুক্তির অমিতচারে ও অত্যধিক উদ্‌ব্যক্তিপ্রবণতায় বুদ্ধদেব বসুর কাব্য কখনো-কখনো যথার্থই অবসাদজনক ("কালো চুল", "কঙ্কাবতী") ; সত্য, 'দ্রৌপদীর শাড়ি'র কোনো-কোনো কবিতা প'ড়ে এ-কথাও আমাদের মনে হ'তে পারে যে বুদ্ধদেব যেন ভাষার সুন্দর কোনো নকসা বোনবার জন্যই কবিতা লেখেন ("দ্রৌপদীর শাড়ি", "কাঁটা"), এবং অনেক ক্ষেত্রে তিনি অনেক কথা বসিয়ে যান শুধুমাত্র

দুর্বার শব্দমোহের বশেই, বাক্‌ভঙ্গির চাতুর্য ও চমৎকারিতার অনতিক্রম্য প্রলোভনে—এ-সমস্তই তাঁর কাব্যের দীর্ঘস্থায়ী তারুণ্যলক্ষণ; তবে, এই সঙ্গে এ-ও মন্তব্য যে, যে-মন্ময়গুপ্তি যে-কোনো উচ্চতর শিল্পের পক্ষে অবর্জনীয়, বুদ্ধদেব বসু তা-ও আয়ত্ত করতে পেরেছেন, কেননা তাঁর অনেক কবিতাই এক কঠোর অনুপাতবোধ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ("দময়ন্তী", "কবিজীবনী", "নির্মম যৌবন", "ছিন্নসূত্র")। তাঁর নাট্যগীতিকাব্য "দময়ন্তী" পড়তে-পড়তে বার-বার রবীন্দ্রনাথের অপরূপ কবিকৃত্যকেই স্মরণ করতে হয়, কোনো প্রভাবের জন্য নয়, এ-জাতীয় শিল্পিক পরোৎকর্ষের তুলনা একমাত্র রবীন্দ্রনাথই সম্ভব ব'লে। মনন ও সংরাগের রাসায়নিক একাত্মীকরণে, ভাষা ও ছন্দের ঋজু স্বাচ্ছন্দ্যে, বাক্‌ছন্দের সার্থক প্রয়োগে এবং ঐশ্বর্যের মিতব্যয়িতায় "দময়ন্তী" আধুনিক বাংলাকবিতায় তুলনারহিত। 'দ্রৌপদীর শাড়ি'-তে একদিকে যেমন দূর অতীতের পুনরাবৃত্তি, ক্লাস্তিকর আত্মানুকরণ, অন্যদিকে তেমনি প্রৌঢ়ির প্রশান্ত সংযম, নতুন ভবিষ্যতের সুস্পষ্ট সংকেত; একদিকে যেমন কীটসের মতো বর্ণাঢ্য চারুচিত্র, অন্যদিকে তেমনি ওয়ার্ডস্বার্থীয় শুভ্র অল্পাভরণ, ধ্রুবসাহিত্যের কঠোর মিতাচার। "প্রতিবিম্ব", "কার্তিকের কবিতা" ও "মধ্যবয়সের প্রার্থনা", এ-তিনটি কবিতায় ভাষা ভাবের স্বচ্ছতম আয়না, যেজন্য জীবনানন্দ দাশের অনুকরণ ক'রে বলতে ইচ্ছা করে 'ভাষাই কবিতা'। ছন্দের প্রশান্ত গাম্ভীর্য, স্তবকের সুষমা, ভাষার সারল্য, গঠনের প্রতিসাম্য ও ঘনতা এবং ভাবের গভীরতা বার-বার গ্রীক কাব্যাদর্শকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। তিনটি কবিতাই মিল, স্তবক ও ছন্দের অভিনব বয়নে, প্রত্যেকটি শব্দের অপরিহার্যতায় এবং প্রত্যেকটি পংক্তির স্মরণীয়তায় বার-বার আবৃত্তি করবার যোগ্য।

২

আমার মতে, বাংলা কবিতায় আধুনিক কবিদের সব চেয়ে বড় দান, এক, কবিতার বিষয়ের প্রচলিত সীমারেখার সম্প্রসারণ এবং দুই, এই ঐতিহাসিক ঘটনা: অস্পৃশ্য অন্ত্যজদের জন্য বাংলা-কাব্যের মন্দিরের দ্বার উন্মোচন,

তথাকথিত, 'কাব্যিক' ও 'অ-কাব্যিক' শব্দের মিশ্রণ। বাংলায় যাঁরা কবিতা লেখেন তাঁরাই জানেন, পাঠকের মজ্জাগত কুসংস্কারের জন্য বাংলা কবিতায় অনেক সজীব শব্দ এবং সেই সঙ্গে বস্তু সাবধানে বর্জন ক'রে চলতে হয়, এমন-কি দৈনন্দিন জীবনে যে-সমস্ত শব্দ বা বস্তুর সংস্পর্শে সর্বদাই আসতে হয়, আমাদের হার্দ্য কবিতায় তাদের স্থান দেওয়া কৃত কঠিন। বাংলা শব্দের অর্থাবনতি খুব সহজেই হয়, এবং যেমন নৈতিক চরিত্রের সম্পর্কে, তেমনি ভাষা সম্বন্ধেও আমরা নিতান্ত শুচিবায়ুগ্রস্ত। আজ পর্যন্তও আমাদের মধ্যে অনেকে হয়তো ভাবতেও পারবেন না যে "মশা" বা "ক্যাঙারু"র ওপরও হার্দ্য—এমন-কি মহৎ—কবিতা লেখা যায়, অথচ ইংরেজিতে ডি এইচ. লরেন্স তা-ই করেছেন। প্যাঁচা, ইঁদুর প্রভৃতি কাব্য-জগতে অনভ্যস্ত জীবকে কবিতায় স্থান দেবার জন্য আধুনিক যুগের সব চেয়ে মৌলিক প্রকৃতির কবি জীবনানন্দ দাশকে সেদিন পর্যন্তও আমাদের কোনো-এক অল্পবুদ্ধি সমালোচক ঐতরিক ভাষায় বিদ্রূপ করেছেন। ভাষা এবং বস্তু সম্বন্ধে এই কুসংস্কার বা শুচিতাবোধ হয়তো রবীন্দ্রনাথের অতি সূক্ষ্ম, অতি মার্জিত ভাব-সাধনারই পরোক্ষ ফল, কেননা মধ্যযুগে ঈশ্বর গুপ্ত পর্যন্তও তো আমাদের কাব্যের ভাষা ও বিষয় কী চমৎকার বাস্তব। এমন কি, যে-বৈষ্ণব-পদাবলী দীপ, চন্দন, ফুলের মালার ঐতিহ্যের জন্মদাতা, তাতেও সেদিন এই ধরনের পংক্তি লেখা সম্ভব হয়েছিল:

একে দহদহ ঘসির আগুন
আরে কে না জ্বালে ফুকে।

প্রধানত আধুনিক কবিদের চেষ্টার ফলেই (রবীন্দ্রনাথ এই আধুনিক কবিদের অগ্রনায়ক) আজ গদ্যকবিতায় যে-কোনো শব্দ বা বস্তুকে স্বীকার ক'রে নিতে বাঙালী পাঠক অভ্যস্ত, কিন্তু পদ্যরচনায় এই মিশ্রণের কাজ—নতুন বৌয়ের লজ্জা ভাঙানোর মতো—এখনও ধীরগতিতেই করতে হচ্ছে, এবং হয়তো তা-ই করা উচিত। এ-বিষয়ে বুদ্ধদেব "আস্তে চলো" নীতিরই পক্ষপাতী: বাস্তবতার খাতিরে অসংগতি বা বেসুরকে তিনি খুব বেশিদূর মেনে নিতে রাজি নন। যা-কিছু নতুন তিনি করেন সাধারণত আমাদের

'প্রতিভা', সাহিত্যের ঐতিহ্য এবং সাধারণ পাঠকের সংস্কার ও রুচির সঙ্গে আস্তে-আস্তে খাপ খাইয়ে নিয়ে করতে চেষ্টা করেন। পারিভাষিক শব্দ, বিদেশী শব্দ, প্রত্যহ-ব্যবহার্য শব্দ বা বস্তু, অতি পরিচিত ভৌগোলিক নাম, এমন-কি বৈজ্ঞানিক তথ্যকেও তিনি অসামান্য ক'রে তুলতে পারেন এবং পারিপার্শ্বিক কাব্যিক আবহাওয়ার সঙ্গে এমন বেমালুম মিলিয়ে দিতে পারেন যে, সব মিলিয়ে যা সৃষ্টি হয় তা একটা সংগীত, একটা সুন্দর সামঞ্জস্য। আমার বক্তব্যের সমর্থনে কয়েকটি উদাহরণ এখানে উপস্থিত করি :

(১) ঘাস, গাছ, রোদ্দুরের অন্তহীন আশ্চর্য কাপড়ে
(২) ঝরিছে আলো আকাশে, যেন মৌন সিনেমার
(৩) যেন তীব্র তপ্ত বেগ হৃৎপিণ্ডে কম্পিত মোটরে
(৪) মায়াবী টেবিলে কুটিল-কঠিন হীরকে

চিকিৎসা-শাস্ত্রের নীরস তথ্যও তাঁর হাতে কাব্যের লোকাতীত সৌন্দর্য লাভ করে :

(১) উদয়াস্ত সূর্য দিলো উজ্জীবনী শোণিত-শর্করা
বিন্দু-বিন্দু তোমার শিরায় ঢেলে···
(২) সেবক-শোণিত কণার কঠিন বধির অবাধ্যতা

দুটি ঘটনাই আজকের দিনে আমাদের জীবনে খুবই পরিচিত। নিচের দুটি উদাহরণ আমার কাছে চূড়ান্ত বিস্ময়কর ব'লে মনে হয়েছে :

(১) রাত্রি নিদ্রাতুর।
বৃষ্টির ঝর্ঝরি স্বর ঝরিছে মধুর
স্বপ্নের অস্পষ্ট মহাদেশে।
যেন দীর্ঘ যাত্রাশেষে
সুদূর সমুদ্রভালে দীর্ঘ নীল টীকা
জলে আমেরিকা। ('দময়ন্তী'—ছন্দ)

(২) কলকাতা ঝরে এক ফোঁটা মধু
অসীমের শতদলে। ('রূপান্তর'—সেতু)

কবিতায় রহস্যময়, সুদূর, সংগীতময় ভৌগোলিক নামের ব্যবহার এর আগেও কোনো-কোনো কবি সাফল্যের সঙ্গেই করেছেন। কিন্তু 'আমেরিকা' বা 'কলকাতা'র মতো অতিপরিচিত ভৌগোলিক নামের—যাকে আমরা প্রত্যহ

সংবাদপত্রে একশোবার ক'রে দেখছি—এই কাব্যিক রূপান্তরণ এ-কথাই প্রমাণ করে যে বুদ্ধদেব কত বড় কারুকর্মী। কে বলবে 'আমেরিকা' বিশুদ্ধ সংস্কৃত শব্দ নয়, সংস্কৃত যুগের কোনো রূপকথার রহস্যময় দ্বীপ নয়, পুরাতন-সুরভি দশার্ণ, বিদিশা, অবন্তী, উজ্জয়িনীর সমগোত্র নয়? কিন্তু কলকাতার ব্যঞ্জনা আরো গভীর। কলকাতা এখানে আর আমাদের কোলাহলমুখর অতিব্যস্ত, স্বার্থের সংঘাতে উন্মত্ত, উন্মথিত, দৈনন্দিন কলকাতা নয়, অসীমের শতদলের এক ফোঁটা মধু। কল্পনার বিশালতায় জীবনানন্দ দাশের 'বোম্বাই'-এর দুঃসাহসিক কাব্যিক রূপান্তরণের সঙ্গেই এর তুলনা, কিন্তু এর ব্যঞ্জনা আরো অনিঃশেষ, আরো সুদূর।

৩

কাব্য-জীবনের প্রায় প্রথম দিন থেকেই বুদ্ধদেব বসু ভাষা ও ছন্দ নিয়ে যে-পরীক্ষা করেছেন তার সঠিক মূল্য নিরূপণ করতে হ'লে রবীন্দ্রনাথের প্রায় সর্বগ্রাসী কবিকৃত্য এবং সেই সঙ্গে উত্তরসাধকের মনে অপ্রতিরোধ্য রবীন্দ্রসম্মোহের কথা অবশ্যই স্মরণে রাখতে হয়। সত্য, পূর্বজের দান বহুমুখ; কিন্তু তৎসত্ত্বেও বাংলা কবিতার ইতিহাসে আধুনিক কবিরাও নতুন কিছু দিয়েছেন এ-কথাও অবিস্মর্তব্য। হয়তো তুলনায় আধুনিক কবিদের মিলিতকর্মও পরিমাণে সামান্য ব'লেই মনে হবে; তবু, আর কোনো কারণে না হলেও ভবিষ্যতের ভিত্তি-প্রস্তর ব'লেই এই দুঃসাহসিক প্রচেষ্টাকে তার ন্যায্য মূল্য দিতেই হয়; এবং যদিও এর অনেক কিছুই এখনও পরীক্ষা নিরীক্ষার অনিশ্চয়তায় কণ্টকিত, তবু সাফল্যের ফসলও কিছু-কিছু ঘরে তোলা হয়েছে, এ-ও ঠিক। 'বাকছন্দের সঙ্গে কাব্যছন্দের মিলন' সাধনে বুদ্ধদেব যে-সফলতা অর্জন করেছেন, বাংলা কবিতার ছন্দ ও ভাষাকে সেটাই রবীন্দ্রনাথ থেকে আরো এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে গেছে, এ-কথা বললে, আশা করি, কবিগুরুকে অসম্মান করা হয় না। রবীন্দ্রনাথ বাংলা কবিতার ভাষা ও ছন্দকে যা দিয়েছেন তার নাম "লাবণ্য"। পক্ষান্তরে বুদ্ধদেব যা দিয়েছেন তার নাম "পৌরুষ"। বাংলায় অন্যান্য কবির তুলনায়, সম্ভবত এক জীবনানন্দ দাশ

বাদে, রাবীন্দ্রিক পয়ারের সঙ্গে বুদ্ধদেবের দূরত্ব সবচেয়ে বেশি। একটি উদাহরণ দিলেই আমার বক্তব্য প্রমাণিত হবে :

রবীন্দ্রনাথ :

যৌবন-বেদনা-রসে উচ্ছল আমার দিনগুলি
হে কালের অধীশ্বর, অন্য মনে গিয়েছ কি ভুলি,
হে ভোলা সন্ন্যাসী।

সুধীন্দ্রনাথ :

হেমন্তের ঊর্দ্ধশ্বাস সাঁঝে
উদ্বাস্তু কালের পায়ে ঝিল্লীর মঞ্জীর যবে বাজে
আচ্ছন্ন মাঠের প্রান্তে···

বুদ্ধদেব

তাহ'লে উজ্জ্বলতর করো দীপ, মায়াবী টেবিলে
সংকীর্ণ আলোর চক্রে মগ্ন হও, যে-আলোর বীজ
জন্ম দেয় সুন্দরীর, যার গানি সমুদ্রের নীলে
কাঁপায়, জ্যোছনায় যার ঝিলিমিলি স্বপ্নের শেমিজ
দিগ্বিজয়ী জাহাজের ভাঙে এনে পুরোনো পাথরে।

নির্বাচিত অংশে রবীন্দ্রনাথ বা সুধীন্দ্রনাথের পয়ারে দৃঢ়তা আছে, গতিও আছে, কিন্তু প্রত্যেকটি শব্দ যেন তার নিজস্ব ব্যক্তিত্ব নিয়ে নিজের পায়ে জোর ক'রে দাঁড়াতে পারে নি, তার সম্পূর্ণ এবং ন্যায্য মূল্য বা ওজন পায়নি, এ-পয়ারের সাদৃশ্য মুখের কথার সঙ্গে নয়, গানের সঙ্গে। কিন্তু বুদ্ধদেবের পয়ারে প্রত্যেকটি শব্দের ব্যক্তিত্ব স্পষ্টভাবে নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে আছে, প্রত্যেকটি শব্দকে তার সম্পূর্ণ ওজন দিয়ে, জোর দিয়ে পড়তে হবে। রবীন্দ্রনাথের পয়ার মধুরতর; কিন্তু বুদ্ধদেবের পয়ারের স্নায়বিক দৃঢ়তা ও বাকছন্দের সঙ্গে সৌসাদৃশ্য রাবীন্দ্রিক এবং আধুনিক অন্যান্য কবির পয়ারে দুর্লভ। অথচ এ-জন্য সুধীন্দ্রনাথ বা বিষ্ণু দের মতো তাঁকে দুর্গম সংস্কৃত শব্দের দ্বারস্থ হ'তে হয় নি।

ইংরেজি ভাষার চরিত্রের সঙ্গে যাঁরা বিশেষভাবে পরিচিত তাঁরাই জানেন যে ল্যাটিন শব্দের ধ্বনিনির্ঘোষ বেশি হ'লেও ছোট একটি টিউটনিক শব্দের

মধ্যে যে জোর আছে, সুবৃহৎ ল্যাটিন শব্দের তা নেই। ওয়ার্ডস্বার্থের বহু-উদ্ধৃত

No motion has she now, no force :
She neither hears nor sees;

এই দুটি পংক্তিতে সরলতার সঙ্গে বলিষ্ঠতার যে-মিলন ঘটেছে মিলটনের সমগ্র Paradise Lost কাব্যে কোথাও তা আছে কিনা সন্দেহ। বাংলা ভাষা সম্বন্ধে বুদ্ধদেব এই গোপন কথাটি জানতে পেরেছেন যে কবিতায় আমাদের প্রত্যহ ব্যবহৃত প্রাকৃত বাংলা বা কথ্য রীতি ব্যবহার করলে যে-জোর আসে, প্রচুর সংখ্যায় দুরূহ সংস্কৃত শব্দের ইস্পাত-সৈন্য সাজালেও তা কখনোই সম্ভব নয়। 'তরু' না ব'লে গাছ, বা 'তৃণ' না ব'লে ঘাস বললে ভাষা যে কত জোরালো এবং স্বাভাবিক হয় 'দময়ন্তী'র "নির্মম যৌবন" কবিতাই তার প্রমাণ।

বিষ্ণু দে যেমন মাত্রাবৃত্তের তেমনি বুদ্ধদেব পয়ারের কবি ব'লেই পাঠক-সমাজে পরিচিত। কিন্তু 'দ্রৌপদীর শাড়ি'তে বুদ্ধদেব মাত্রাবৃত্ত ছন্দকেও অধিকর্তার আত্মবিশ্বাস ও দক্ষতার সঙ্গে ব্যবহার ক'রে আমাদের সশ্রদ্ধ করতালি কেড়ে নিয়েছেন, এবং এ-ক্ষেত্রেও তাঁর স্বভাব-অনুযায়ী দুঃসাহসিক মৌলিকতার অনুসন্ধান করেছেন। বিষ্ণু দের মাত্রাবৃত্তের লঘু বায়বীয়তা, চপল-মধুর গীতি-উচ্ছলতা তাঁর নেই। তাঁর মাত্রাবৃত্ত ('কার্তিকের কবিতা', 'প্রতিবিম্ব') তুলনায় সবল, শান্ত, সুদৃঢ়, ঈষৎ দিবাস্বপ্ন-গম্ভীর কিন্তু অন্তরঙ্গ, শান্ত অথচ সাবলীল, সুদৃঢ় অথচ নমনীয়। একদিক দিয়ে মাত্রাবৃত্ত ছন্দে বিষ্ণু দে আধুনিক বাংলায় যথার্থই দ্বিতীয়রহিত, তবু, স্তবকের অভাবিত গঠন ও বিন্যাস সত্ত্বেও, রাবীন্দ্রিক মাত্রাবৃত্তের সঙ্গে তাঁর মাত্রাবৃত্ত বুদ্ধদেবের তুলনায় ঘনিষ্ঠতর। বুদ্ধদেবের মৌলিকতা এই যে, তিনি মাত্রাবৃত্ত ছন্দেও—যাকে আমরা চিরকাল গানের ছন্দ ব'লে ভাবতেই অভ্যস্ত ছিলুম—বাক-ছন্দের আভাস আনতে পেরেছেন। আভাস, কিন্তু মাত্রাবৃত্তের স্বাভাবিক প্রবণতার দিকে লক্ষ্য রেখে একে এক দুঃসাধ্যসাধন বলাই উচিত। অবশ্যই 'তাহ'লে উজ্জ্বলতর করো দীপ' আর 'কীটসের ডাক এসেছিলো ছাব্বিশে' এক নয়, কিন্তু 'শয়নশিয়রে প্রদীপ নিভেছে সবে' বা 'অঙ্গে কাহারো রাখি না

অঙ্গীকার' মাত্রাসংখ্যার সমতা সত্ত্বেও 'কীটসের ডাক' থেকে আলাদা। শুধুমাত্র গণিতের সাহায্যে কবিতার ছন্দের বিচার ক'রে আমরা যে কত বড় ভুল করি, এই পার্থক্যই তার প্রমাণ। আসলে কবিতার ছন্দের শেষ বিচারক গণিত নয়, শুধু সংখ্যার সাহায্যে কবিতার ছন্দের বিচার করবার যে-পদ্ধতি ছন্দোবিজ্ঞানীদের মধ্যে প্রচলিত, আমার কাছে তা অতি-সরলীকরণের দোষে দুষ্ট ব'লে মনে হয়। 'কীটসের ডাক' এবং 'শয়নশিয়রে' উভয়েরই মাত্রাসংখ্যা চোদ্দ, কিন্তু যাঁরই কান আছে তিনিই বলবেন মাত্রাসংখ্যা এক হলেও এ দুয়ের ছন্দ বা ধ্বনিগুণ ঠিক এক নয়, যদিও উভয়কেই 'মাত্রাবৃত্ত' এই এক নামেই ডাকা যেতে পারে। 'কীটসের ডাকে' স্বরের টান একেবারে অনুপস্থিত নয় সত্য, কিন্তু আগাগোড়া একটা কথোপকথনের ঢং বজায় রাখবার ফলে কাব্যরীতির উঁচু স্বরের সঙ্গে এমন একটা অন্তরঙ্গতার নিচু স্বর লেগেছে যে, পাঠক মুহূর্তেই নিজেকে কবির একান্ত বন্ধু ব'লে অনুভব করেন। বুদ্ধদেবের আরো কৃতিত্ব এই যে, কাব্যরীতির উঁচু স্বরের সঙ্গে কথ্যরীতির এই নিচু স্বরের মিশ্রণ—'কঙ্কাবতী'র পর—তাঁর কাব্যে কদাচিৎ রসাভাসের জন্মদাতা, বরং প্রতিতুলনার ফলে কবিতার 'ভালো লাইনে'র স্বাদ অনেক গুণ বেড়ে গেছে। বুদ্ধদেবের কাব্যে কাব্যরীতির সঙ্গে কথ্য রীতির প্রায় অর্ধনারীশ্বর সম্বন্ধে : সাধারণ কথার ফাঁকে-ফাঁকেই কবিতার বিদ্যুৎ ঝিলিক দিয়ে ওঠে, অথবা সহজ কথোপকথনের ঢঙেই, যথাসম্ভব স্বাভাবিক ভাষায়, স্বর খুব উঁচুতে না তুলেই, তিনি অন্তরের গভীরতম অনুভূতি বা জীবনের মহত্তম সত্যকে প্রকাশ করেন। কোনো-কোনো পংক্তিকে আমার মহাকাব্যের বিশাল নগ্নতার সঙ্গেই তুলনা করতে ইচ্ছা করে। ম্যাথু আর্নল্ড যাকে বলেছেন 'touchstone line' বা নিকষ পংক্তি, আমার মতে নিচের দুটি পংক্তি তারই উদাহরণ :

তবু জীবনের বিজয়ী মাধুরী
কমবে না একতিলও।

কত সহজ, কত সাবলীল তাঁর মাত্রাবৃত্ত :

গ্রীষ্মপ্রেমিক, বর্ষাবিলাসী আমি
দীর্ঘসূত্রী দিবস আমার প্রিয়,

তবু এ-নবীন হেমন্তদিন যেন
মাঝে-মাঝে মোর মনে হয় রমণীয়। ("কার্তিকের কবিতা")

বা এই তো সেদিন বৈশাখ ছিলো
দীপ্তরেখায় আঁকা,
মনে হয় যেন মুখ ফেরালেই
পাবো শ্রাবণের দেখা। (ঐ)

বা ভাবতে পারি না একটি বছর
গেলো এত সহজেই। (ঐ)

বা কিন্তু তখন, বলা বাহুল্য
বয়স সতেরো ছিলো ("প্রতিবিম্ব")

৪

বুদ্ধদেব বসুর বিরুদ্ধে প্রচলিত মন্তব্য—যা কোনো এক পক্ষ থেকে কিছু-কাল হোল নালিশের আকারে শোনা যাচ্ছে—এই যে, তিনি নাকি যথেষ্ট পরিমাণে সমাজসচেতন (শ্রেণীসচেতন?) নন। কবির পক্ষে 'যথেষ্ট পরিমাণে সমাজসচেতন' হওয়া আদৌ বাঞ্ছনীয় কিনা সে-বিষয়ে আমার ঘোরতর সন্দেহ থাকলেও সেদিক দিয়ে তর্ক না তুলে আমি বলব যে, প্রথমত, যদিও বুদ্ধদেবের কাব্যে বিদ্বেষ-কষায়িত রক্তাক্ত কোনো দুষ্প্রচার নেই, এবং সাধারণত তা উপদেশাত্মকও নয় (খুব কদাচিৎ তাঁর কাব্য ইসকুলমাস্টারি করে), তবু, প্রথমত, যুগের স্পন্দন—আশা-আকাঙ্ক্ষা, বিষাদ, সমস্যা, সন্দেহ, সংঘাত ('দময়ন্তী'—"কবি-জীবনী", "পূর্বরাগ", "বিরহ"; 'দ্রৌপদীর শাড়ি'—"কার্তিকের কবিতা") তাঁর কাব্যে অনুপস্থিত নয় ('দময়ন্তী'র "কবি-জীবনী"-কে তো আমার এ-যুগের মহাকাব্য বলতে ইচ্ছা করে, একটা সমস্ত যুগ এতে বিধৃত : আধুনিক কালের বেদনা, বিষাদ, স্বপ্ন এতে পরাৎ-পর ভাষায় প্রকাশ করেছেন কবি। যুগপ্রবৃত্তিকে এখানে তিনি সেই সমুদ্ধতর, নৈর্ব্যক্তিক, বৈশ্বিক এবং অলৌকিক স্তরে উন্নীত করতে পেরেছেন যে-স্তরে পৌঁছলে সর্বধ্বংসী মৃত্যুও পরাস্ত। (আমি বেশ কল্পনা করতে পারি, বুদ্ধদেব বসুর 'কবি-জীবনী' মহাকালের টেবিলের ওপর চিরকালের

অন্য খোলা রয়েছে, পক্ষান্তরে ছেঁড়া-কাগজের ঝুড়িতে সমাজচেতনার নাম নিয়ে এ-যুগের দলভুক্ত কবিরা যে-সমস্ত কবিতারূপী ইস্তাহারপত্র লিখেছেন তার সবগুলিই নিক্ষিপ্ত।) এবং, দ্বিতীয়ত তার চেয়েও যা বড় কথা উপদেশাত্মক যে-কোনো বিপুল গ্রন্থসংগ্রহের চেয়ে তাঁর কাব্যের সখ্য সাযুজ্য সমাজ-মানসের পক্ষে ঢের বেশি হিতকর; সুতরাং যদিও সমাজ-সংস্কারক বা ভাবিকৃথকের উদ্দীপনা তাঁর নেই, তবু তাঁর কাব্য সমাজের পক্ষে আদৌ অপ্রয়োজনীয় তো নয়ই, বরং যেহেতু তা, মোটের উপর, স্বাস্থ্যকর, এই নৈরাশ্যপীড়িত, সন্দেহ-কুটিল, বিদ্বেষ-বিষাক্ত, স্বার্থের সংঘাতে উন্মত্ত, অস্থির যুগে—এই অসুস্থ 'কালো হাওয়া'য়, সমাজ-ব্যবস্থার প্রতি অসন্তোষ যখন জীবন-বিদ্বেষের আত্মঘাতী মানসতায় পর্যবসিত, জীবনের যখন কোনো মূল্যই নেই, না নিজের, না অপরের, মৃত্যুরও কোনো মহিমা নেই—বুদ্ধদেব বসুর মতো কবির আবশ্যকতা আরো বেশি নিশ্চিত। বুদ্ধদেবের কাব্য সম্বন্ধে সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য এই যে, জীবন তাঁকে কখনো-কখনো নিরাশ করলেও, এবং স্বপ্নের সঙ্গে বাস্তবের, সাধনার সঙ্গে সিদ্ধির বৈসাদৃশ্য সম্বন্ধে, পোকায়-কাটা সমাজের দোষ-ত্রুটি, অসম্পূর্ণতা ও নির্লজ্জ বৈষম্য সম্বন্ধে, এ-যুগের অন্যান্য কবির মতো একান্তভাবে সচেতন হ'য়েও, জীবনকে তিনি গভীরভাবে ভালোবাসেন—প্রেমিকের মতো—এবং সে-ভালোবাসাকে পাঠকচিত্তে প্রত্যক্ষভাবে সঞ্চারিত ক'রে দিতে পারেন—দীপ থেকে দীপের মতো। আর, তাই, বিশেষ কোনো জীবনদর্শন বা বিশ্বাসের সুসমঞ্জস প্রকাশ এবং পরিবর্ধন তাঁর কাব্যে লক্ষ্য করা না গেলেও, জীবনের প্রতি এই ভালোবাসাই শেষ পর্যন্ত তাঁর কাব্যকে এক মহত্তর পর্যায়ে নিয়ে পৌছিয়ে দিয়েছে। বর্তমান যুগের প্রধান দুটি ব্যাধি নৈরাশ্য-ও-ক্লান্তি এবং হিংসা—Aldous Huxley যার প্রথমটির নামকরণ করেছেন acedia (আধুনিক যুগের এই দুই প্রবৃত্তিকে আমি একসঙ্গে দেখছি, কেননা এ দুটিই একই সামাজিক অবস্থার প্রতিক্রিয়ার এপিঠ-ওপিঠ: একটি নেতিবাচক, অন্যটি ধ্বংসকর অর্থে সদর্থক, এইমাত্র তফাৎ), এই যুগ্ম বিকৃতির দ্বিতীয়টি থেকে বুদ্ধদেব বসুর কাব্য দেবতার

মতোই মুক্ত; তবে যুগের সর্বব্যাপী নৈরাশ্য, এমন-কি শুভনাস্তিক্য, তাঁর কাব্যেও যে ছায়াপাত না করেছে এমন নয়, এ-কথা আমি একটু আগেও বলেছি। কিন্তু, স্বস্তির কথা, যুগের ব্যাধিতে ভুগেও তাঁর মুখের স্বাদ নষ্ট হয়নি, এক অসাধারণ জীবনীশক্তিবলে সমস্ত ব্যাধি, সমস্ত বিকৃতিকে তিনি অতিক্রম করতে পেরেছেন। 'তবু জীবনের বিজয়ী মাধুরী কমবে না একতিলও।' তবু, অর্থাৎ জীবনের ক্ষয়-ক্ষতি, দোষ-ত্রুটি, অসম্পূর্ণতা আছে সত্য, তবু শেষ সত্য তার 'বিজয়ী মাধুরী'—যদিও আপাতদৃষ্টিতে সতেরো বছরের অনুভবের কথাই বুদ্ধদেব এখানে বলেছেন, তবু সমস্ত দ্বিধাদ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে এই সিদ্ধান্তের দিকেই তাঁর কাব্যসাধনার শেষ লক্ষ্য ব'লে আমার বিশ্বাস। কিন্তু, এতৎসত্ত্বেও, এ-কথা অবিস্মর্তব্য যে বুদ্ধদেব এ-যুগেরই কবি। প্রত্যেক মহৎ কবি নিজের কথা বলতে গিয়ে যুগের কথাই বলেন, 'in writing himself, writes his time', এলিয়টের এ-মন্তব্য বুদ্ধদেবের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। তবে এ-ও ঠিক যে কোনো-কোনো কবি শুধু যুগ-প্রবৃত্তির সীমানাতেই বন্দী থাকেন না, তাকে ছাড়িয়ে ভবিষ্যতের দিকেও—অর্থাৎ পূর্ণতর জীববের দিকেও—পদক্ষেপ করেন।

বুদ্ধদেব বসু যুগের কবি হ'য়েও যুগকে ছাড়িয়ে উঠতে চেষ্টা করেছেন, তাঁর সমস্ত কাব্যসাধনা এই ছাড়িয়ে ওঠারই ইতিহাস। তাই, একদিকে সাম্যবাদের মূলনীতিতে বিশ্বাসী হ'য়েও—কে-ই বা তাকে অস্বীকার করে?—এবং তার ভাবধারায় একদা প্রভাবান্বিত হ'য়েও, বুদ্ধদেব কদাচিৎ কালপুত্তলির দাসত্ব করেছেন। কবিতার ক্ষেত্রে এ আন্দোলনের মারাত্মক চোরাগর্তগুলি চিনে ফেলতে তাঁর খুব বেশি দিন লাগেনি। বুদ্ধদেব কখনোই কবি ও কর্মীর মৌলিক পার্থক্য ভুলে যান নি, লেখনীকে অসাহিত্যিক প্রচারকর্মে নিযুক্ত করেন নি বা হারিয়ে ফেলেন নি জীবনের মৌল মূল্যবোধ। এমন কি, বুদ্ধিজীবীর হৃদয়ে সাম্যবাদের সেই গৌরবময় সাম্রাজ্য-বিস্তারের যুগেও, তাঁর কাব্যে ভবিষ্যতের স্বপ্ন আছে, বিষাদ আছে, কখনো-কখনো সমাজব্যবস্থার তীব্র, সূক্ষ্ম, বিদ্রূপাত্মক সমালোচনাও আছে, কিন্তু রক্তপিপাসু হিংসা বা সাম্প্রদায়িক প্রচারকর্মের নাম-গন্ধ নেই। অন্যদিকে কোনো-কোনো আধুনিক

কবির মতো বুদ্ধদেব আগাগোড়া কোনো নেতিবাচক দর্শনের কালো চশমা চোখে প'রে জীবনটাকে দেখতে চেষ্টা করেন নি, ভুল করেন নি সেলাইয়ের উলটো পিঠকেই জীবনের একমাত্র রূপ বলে। তাই তো তাঁর মন কখনো 'নিঃসুর' হোল না, তাই তো ঘাস, গাছ, রোদ্দুরের ডাকে আজও তিনি উত্তর দিতে ভোলেন না, এবং কি গদ্যে, কি পদ্যে, শব্দের এবং প্রকরণের অফুরন্ত রহস্যের অনুসন্ধানের অক্লান্ত উৎসাহ এবং সাফল্যের আনন্দে তাঁর রচনার প্রত্যেকটি পংক্তি সন্দীপ্ত। তাই তো তিনি এ-যুগেও লিখতে পারেন :

পৃথিবীর যৌবনের দিন
যাদের হৃদয়ে অন্তহীন, জীবনের উন্মাদ নবীন
গ্রীষ্ম যাদের বাহুতে বাঁধা :—সেই সব নবদম্পতীরা
সুখী হোক, আহা, সুখী হোক। ("পৌষ সংক্রান্তি")

বা

দৈব দয়ায় কিছু যদি থাকে দাবি,
তবে যেন আমি বাঁচি
এক শো বছর, অন্তত কাছাকাছি ("প্রতিবিম্ব")

বা মনে-মনে আমি তারই দিন গনি—
বেঁচে থাকা তবু ব্যর্থ হয়নি,
শান্ত প্রবীণ হেমন্ত দিন
তা-ও লাগে সুমধুর। ("কার্তিকের কবিতা")

বাংলা সাহিত্যের বহু প্রতিভাবান কবির অকালবন্ধ্যত্ব এক্ষেত্রে শিক্ষাপ্রদ : কেন সুধীন্দ্রনাথ, সমর সেন বা সুভাষ মুখোপাধ্যায় আর লিখতে পারলেন না, কেন ইংরেজি বাংলা আধুনিক যুগের অনেক কবিতাই এত বৈচিত্র্যহীন, এ প্রশ্নের উত্তর আজ নিশ্চয়ই ভালো ক'রে ভেবে দেখা প্রয়োজন।

When lovely woman stoops to folly and
Paces about her room again, alone,
She smooths her hair with automatic hand,
And puts a record on the gramophone.

এলিয়টের এ-পংক্তিগুলি অত্যন্ত মুখরোচক স্বীকার করি, কিন্তু সেই সঙ্গে এ-ও বলতে হয় যে এই শুভনাস্তিক্য সহজ কবি-প্রেরণার অন্তরায়, এবং মানুষ

ও জীবনের প্রতি এই উন্নাসিক মনোভাব নিয়ে কখনোই বেশি দিন কবিতা লেখা চলে না। বুদ্ধদেব বসুর সহজাত কবি-প্রবৃত্তি—যাকে বলতে পারি তাঁর চারিত্র, কবির চারিত্র—এ-ক্ষেত্রে তাঁকে বাঁচিয়ে দিয়েছে। আর, এই চারিত্র আছে ব'লেই নিন্দার ক্লেদাক্ত জিহ্বাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা ক'রে অবিচল সাহস ও নিষ্ঠার সঙ্গে তিনি তাঁর সাহিত্য-সাধনাকে বাঁচিয়ে রেখে দৃঢ়পদে ধাপে-ধাপে উঠে যেতে পেরেছেন। এবং সেইজন্যই তো এ-কথা তিনি বলতে পারেন—

আমার আকাঙ্ক্ষা তাই কবিত্বের অদ্বিতীয় ব্রত

আর সে-প্রতিজ্ঞা অক্ষরে-অক্ষরে পালন ক'রে চলতে পারেন। কোনো-কোনো প্রতিভাবান সাহিত্যিকের মতো 'অন্য, হীন প্রভু'র দাসত্ব আজ পর্যন্তও তিনি মেনে নেন নি। তাই শুধু তাঁর বিস্ময়কর কবি-প্রতিভার জন্যই নয়, যা না থাকলে অন্য সবই ব্যর্থ হোত, সেই চারিত্র—কবির সেই চারিত্রের জন্যও বুদ্ধদেব বাংলার তরুণ কবিসমাজের নমস্য।

সমালোচনা

দূরের আকাশ, অরুণকুমার সরকার। মিত্রালয়, ২,
অবতামসী, আবার রাত্রি, বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়। কবিতাভবন, ২,
মিলিতা, সুনীলচন্দ্র সরকার। প্রাপ্তিস্থান, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ৸০ ও ১৲

তিনজন কবির প্রথম কবিতার বই একসঙ্গে হাতে পাওয়া সমালোচনার পক্ষে ভাগ্যের কথা—যখন বইগুলিতে স্বকীয়তার আস্বাদ থাকে। আলোচ্য বই তিনটি, অত্যন্ত সুখের বিষয়, নেড়ে-চেড়ে রেখে দেবার মতো নয়, নেড়ে-চেড়ে বার-বার পড়বার যোগ্য—আর যে-লেখা বার-বার পড়া যায় না, তা, আর যা-ই হোক, কবিতা যে কখনোই নয়, এ-কথা কবিতার পাঠকমাত্রেই জানেন। এই তিনজনের লেখাতেই বস্তু আছে, বিন্যাস আছে, আর আছে সেই সরসতার গুণ, যা এ-যুগের নিপুণ লেখকদের রচনাতেও সব সময় পাওয়া যায় না। তিনজনেই কলাকৌশল বিষয়ে সচেতন, ভাষায় ব্রাত্যধর্মী, এবং অভিনব বিষয়বস্তু সন্ধান করতে সচেষ্ট। তিনজনের লেখাই আধুনিক কালের লক্ষণযুক্ত, তাতে দেখতে পাই নৈরাশ্যের ছায়া, দ্বন্দ্বের বেদনা—কিন্তু সব সংশয় পেরিয়ে জীবনের উপর বিশ্বাস যে এঁরা রাখতে পেরেছেন, তাতে সাম্প্রতিক বাংলা কবিতার স্বাস্থ্যে প্রত্যাবর্তনের পরিচয় পাওয়া গেলো।

এই-যে সামান্য লক্ষণগুলোর কথা বললুম, পাত্রভেদে তার তারতম্য অবশ্য আছে। কলাকৌশলে সবচেয়ে নিপুণ অরুণকুমার সরকার, ভাবের বৈচিত্র্যও তাঁর মধ্যে সবচেয়ে বেশি; 'দূরের আকাশে'র চল্লিশ পৃষ্ঠার মধ্যে যত রকম বিচিত্র ছন্দে যত বিভিন্ন মানসিক অবস্থা বা mood-এর সাক্ষাৎ মেলে, তরুণতর কবিদের রচনায় তার তুলনা চট ক'রে মনে পড়ে না। ব্যঙ্গ, পরিহাস, হৃদয়াবেগ, জীবনানন্দর পরবর্তী ধরনে পেঁচিয়ে-বলা অস্পষ্টতা থেকে সরল, অন্তরঙ্গ উচ্চারণ, এবং গদ্য মেজাজের আঁটোসাঁটো তার্কিক পদ্য—অরুণকুমারের লেখনী এর কোনোটাতেই অপ্রস্তুত হ'য়ে পড়ে না। সবগুলোতেই তাঁর কৃতিত্ব সমান এ-কথা বলবো না, তাছাড়া এই ক্ষুদ্রাকার—এবং লেখকের প্রথম—বইয়ের মধ্যে এত রকম বিভিন্ন সুরযোজনা অমিশ্র প্রশংসার কথাও নয়। এর ফল একটা হয়েছে এই যে 'দূরের আকাশ' একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ বই হ'তে পারেনি, বরং যেন 'নির্বাচিত কবিতা'র মতো মনে হয়—এবং সেখানেও নির্বাচনের ঔচিত্য সম্বন্ধে কোনো-কোনো ক্ষেত্রে সংশয় জাগে। আর-একটা কথা এই মনে হয় যে অরুণকুমার যেন এখন পর্যন্ত বিভিন্ন ধরনে পরীক্ষা ক'রে যাচ্ছেন মাত্র, নিজের কথা নিজের মতো

ক'রে বলবার বিদ্যা তাঁর আয়ত্ত হয়নি। কিন্তু তবু, তাঁর মনের স্বাভাবিক ঝোঁকটি যে কোন দিকে, এবং কেমন ক'রে বললে তাঁকে সবচেয়ে বেশি মানায়, সে-কথাটি পাঠকমাত্রেই বুঝতে পারবেন, অতএব তাঁর নিজের কাছেও নিশ্চয়ই গোপন নেই। 'দূরের আকাশে' ব্যঙ্গ, তর্ক, জল্পনা সবই আছে, কিন্তু লেখকের যেটি গভীরতম, আপনতম সুর, সেটি প্রকাশ পেয়েছে হার্দ্য কবিতায়। 'রবীন্দ্রনাথ' নামক কবিতায় প্রবীণ ও নবীন কবির বিতর্কটি গদ্য-পদ্যের অবাধ মিলনের একটি নিখুঁত নিদর্শন, দু-একটি ছোট্ট গদ্য-কবিতায় কৌতুকচিত্রও উৎরে গেছে, কিন্তু বই খুলেই প্রথম যখন পড়ি—

সিন্দুক নেই; স্বর্ণ আনিনি,
এনেছি ভিক্ষালব্ধ ধান্য।
ও-দুটি চোখের তাৎক্ষণিকের
পাব কি পরশ যৎসামান্য?

আর 'ক্রিসান্থিমাম' কবিতায় একই ছন্দে যখন বেদনার সুর লাগে—

ভালোবাসা তুমি সুদূর শঙ্খচিল
অনেক দূরের নীলে।
আজ মনে হয় হয়তো বা নয় ভুল
হয়তো বা ডেকেছিলে।

তখনই এই কবির জাত চিনতে আমাদের দেরি হয় না। আসলে এই সুন্দর স্তবক দুটি এঁর রচনার মধ্যে আকস্মিক নয়, এই বইয়ে অন্তত পাঁচটি-ছ'টি কবিতা আছে যাতে অনুভূতির পলাতক পাখি বাণীর প্রেমে বন্দী হয়েছে—এই ঘটনার অর্থ যে কতখানি তা মনে রাখলেই সংখ্যাটাকে নগণ্য ব'লে মনে হবে না। আমি তো মনে করি যে

বৃষ্টিভেজা বাড়ির মতো রহস্যময়
তোমার হাতে আছে আমার একটু সময়।
কত দিনের কত রাতের ঝাপসা তুলির
রঙে রেখায় আঁকা আমার একটু সময়।

এই রকম একটি ক্ষুদ্র, সুসম্পূর্ণ, ইঙ্গিতময় কবিতা লেখার জন্য যে-কোনো কবিরই ভাগ্যবান হওয়া প্রয়োজন, এবং এ-রকম একটি কবিতাও যিনি লিখতে পেরেছেন, তাঁর সম্বন্ধে আমাদের আরো অনেক আশা থাকলো।

বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনার সঙ্গে অনেকদিন ধ'রেই আমার পরিচয় আছে, আমাদের তরুণতর কবিদের মধ্যে তাঁকে আমি উল্লেখযোগ্য মনে করি। তাঁর রচনার ঝোঁক লালিত্যের দিকে, ছন্দে-মিলে ঝংকৃত পদবিন্যাসের দিকে

(তিন মাত্রার ছন্দই তিনি বেশি ব্যবহার করেন), এবং যদিও একটু প্রকট অনুপ্রাসের লোভ কখনো-কখনো তিনি সামলাতে পারেন না, এবং অপ্রচলিত সংস্কৃত শব্দও মাঝে-মাঝে অসংগতভাবে ব্যবহার করেন, তবু তাঁর 'অবতামসী আবার রাত্রি'তে মোটের উপর একটি ভাবুক চিত্তের আর সেই সঙ্গে একজন সাবধানী কারুকর্মীর সাক্ষাৎ পাওয়া গেলো।

এ-জীবনে কতো প্রাণ দূর হ'য়ে গেলো—
কতো গান।—তারে মান দিক এ-কবিতা।

বইয়ের এই প্রথম কবিতা অনেকের মনেই অনুরণন জাগবে, এবং 'ময়লা গলির উপকথা'র মতো দীর্ঘতর নাটকীয় কবিতায় একটু স্বতন্ত্র রকমের গঠনশক্তিরও পরিচয় আছে। নাটকীয় মানে সংলাপে বিন্যস্ত নয়, কোনো-একটি কাহিনীতে আশ্রিত, কিংবা কাহিনীটি প্রচ্ছন্ন রেখে মন্তব্যের স্বগতভাষণ। লিরিক শিল্পেও লেখক অনধিকারী নন, বইয়ের অনেক কবিতাই প্রণয়ঘটিত, কখনো চপল, কখনো বিষণ্ণ, ভাবের সঙ্গে ছন্দ, ভাষারও যথোচিত বদল হচ্ছে। 'প্রণয়-প্রেক্ষা', 'মরা সাধ' রূপায়ণের মনোহর দৃষ্টান্ত, কিন্তু বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায় আরো একটা বড়ো জগতে আমাদের নিয়ে গেছেন 'আসঙ্গের পতঙ্গ' নামক কবিতায়, যেখানে একটি উজ্জ্বল সকালবেলাকে একটি পতঙ্গের ক্ষণজীবী প্রাণ দিয়ে তিনি অনুভব করেছেন। এই জীবন-বন্দনার পাশে-পাশেই জরাচেতন, মৃত্যুচেতন অনেকগুলি কবিতা স্থান পেয়েছে, তার মধ্যে আমার সবচেয়ে ভালো লাগলো 'কোনো মৃত্যুর শিয়রে—আবহমান'।

বর্ষার মেঘে থাকবেই লেগে তোমার দেহের কণা
—এই কথা ভুলবো না।
নদীজলে গ'লে মিশে যাবে কোনো তোমার দেহের কণা
—এই কথা ভুলবো না।
যে-মাটিতে গাছ ফুল হ'য়ে ফোটে—তোমার দেহের কণা
—তারও কথা ভুলবো না।
আকাশে বাতাসে যে-ছাই ছড়াবে তোমার দেহের কণা
—তারও কথা ভুলবো না।

এই মন্ত্রের মতো পুনরুক্তিতে এমন একটি উঁচু সুর লেগেছে যা আবার এবং বার-বার ধরতে পারলে বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায় কীর্তিমান হবেন।

'মিলিতা' সম্বন্ধে আমার দুটি আপত্তি আছে। প্রথমত নামের জন্য : এ-রকম নাম বিয়ের উপহারে উদ্দিষ্ট হ'লেই মানায়; দ্বিতীয়ত আকারের জন্য, এ-রকম চটি প্যাম্ফলেটের মতো চেহারায় কবিতার মর্যাদা রক্ষা হয় না—বিশেষত

লেখক যদি সাহিত্যক্ষেত্রে নবাগত হন। আপত্তি দুটি নিবেদন করবার কারণ এই যে সুনীলচন্দ্র সরকার রীতিমতো ভালো লেখেন, তাঁর রচনায় বৈশিষ্ট্য আছে—যে-চোখে তিনি চরাচরের দিকে তাকিয়ে জাগেন তাতে কৌতূহল আছে কিন্তু আসক্তি নেই। এবং কবিতার ভাষায় কথ্যরীতির প্রাণ বেগ সঞ্চারিত করতেও তিনি সক্ষম :

এই খোলা পথে চলতে চলতে
মনের কথা কি পারবো বলতে!
যাওয়ার তাড়ায় আড়ে নিই দেখে
মাঠের চাকাটা চলে এঁকে বেঁকে,
পথ গ্রাম হাট গাছ সারে সার
ছবি থেকে চলে ছবিতে আবার…('খোলা পথ')

'খোলা পথ', 'চিল : মেয়ে : কবি', 'জামতলা', এ-সব কবিতা 'কবিতা'র পাঠকদের মনে পড়বে—গত চার-পাঁচ বছরের মধ্যে বাংলা ভাষায় যত কবিতা লেখা হয়েছে তার মধ্যে 'জামতলা' অন্যতম স্মরণীয়। জামতলায় দাঁড়িয়ে দূর থেকে নিজের বাড়ির দিকে তাকানো—

কেমন খেলনা বাড়িটা তোর
দপদপ করে জানলাদোর
মানুষ বাঁচার ঢেউচলায়

তারই মধ্যে অনতিক্রম্য দৈনন্দিন জীবন—

জুতোয় জামায় সেঁধিয়ে বেরিয়ে
সময়ের গাঁট অনেক পেরিয়ে
ফের মশারিতে ঘননিকাপাত
চোখে জল দিয়ে আবার প্রভাত।
বাইরে এখানে জামছায়ায়
ঘটে না কিছুই সারা দুপুর।
এ শুধু সময়বহার সুর।
মনের বাঁধুনি এলিয়ে যায়।

এই সুন্দর ছবিটিতে লেখক নিজের চরিত্র প্রমাণ করেছেন; আশা করি ভবিষ্যতে তাঁর সম্পূর্ণতর কাব্যগ্রন্থ শোভনতর আকারে দেখতে পাবো।

'ঘোড়া' কথাটার 'ঘোঁড়া' বানান দেখে মর্মাহত হয়েছি।

বু.ব.

পূর্ণ কুম্ভ: রানী চন্দ। বিশ্বভারতী, ৪৲।

শ্রীমতী রানী চন্দ ক্রমশই আমাদের অবাকতর ক'রে দিচ্ছেন। রবীন্দ্র-অবনীন্দ্রনাথের আড়ালে-আড়ালে গত দশ-বারো বছর আত্মগোপন ক'রে এসেছেন তিনি, বিদ্যুৎপ্রভ কথকতার সুযোগ্য লিপিকারিণীরূপেই তাঁকে আমরা প্রথম জেনেছিলুম। কিন্তু তা ছাড়াও বাংলা সাহিত্যে তাঁর যে নিজস্ব কিছু দেবারও আছে, তা তিনি প্রথম প্রমাণ করলেন 'জেনানা ফাটক' লিখে। বাংলা ভাষায় কারাবাসের অভিজ্ঞতা নিয়ে যে-সব গ্রন্থ রচিত হয়েছে—উপেন্দ্র-বারীন্দ্রের 'নির্বাসিতের আত্মকথা' আর 'দ্বীপান্তরের কথা'তে যার গৌরবময় সূত্রপাত—'জেনানা ফাটক' সেই সাহিত্যধারায় একটি উল্লেখ-যোগ্য সংযোজন। শ্রীমতী চন্দর প্রধান গুণ তাঁর ভাষার সাবলীলতা—ঠিক মুখে বলা কথার মতোই লেখেন তিনি, হয়তো তার একটা কারণ এই যে মুখের কথা কাগজে তুলেই তিনি হাত পাকিয়েছেন। তাঁর নতুন এবং বৃহত্তর বই 'পূর্ণ কুম্ভে'ও এই গুণ বর্তমান। ডায়েরির পৃষ্ঠা গেঁথে-গেঁথে, ধারাবাহিকতা রক্ষা ক'রে, এবং সেই সঙ্গে সমস্ত বৃহন্নিকে রসোজ্জ্বল ক'রে তুলে তিনি এই গ্রন্থে প্রাকৃত প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। আটপৌরে ঘরোয়া ভাষা তরতর ক'রে ব'য়ে চলেছে, কিন্তু বর্ণনায় অবসাদ নেই, তার উপর—অত্যন্ত সুখের কথা—শ্রীমতী চন্দ দু-চোখ দিয়ে কৌতুক কুড়োতেও জানেন। সব মিলিয়ে যা পাওয়া যায় তা একটি পরিচ্ছন্ন মেয়েলি আবহাওয়ার স্বাদ, একটি অনুভূতিপ্রবণ সংবেদনশীল মনের স্পর্শ। 'পূর্ণ কুম্ভ' প'ড়েই আমার সিদ্ধান্ত আরো গভীর হ'লো যে ডায়েরি-ধাঁচের রচনাকে সৃষ্টির পর্যায়ে তুলতে হ'লে সবচেয়ে যা প্রয়োজন তা ভাষার সারল্য। (ফরাশি দার্শনিকদের প্রসঙ্গ এখানে না-ই বা তুললুম।)

'পূর্ণ কুম্ভ' মোটামুটি হরিদ্বার বৃন্দাবন কাশী হৃষীদেশ ইত্যাদি কয়েকটি জায়গায় তীর্থভ্রমণের কাহিনী। ভ্রমণের প্রাসঙ্গিকতাই প্রধান স্থান পেয়েছে, কিন্তু বইটির মূল সুর ভক্তিবাদে সম্পৃক্ত। যাঁরা ভক্তিবাদে বিশ্বাসী তাঁরা এতে খুশি হবার মতো প্রচুর উপাদান পাবেন; পৌরাণিক—বিশেষত বৈষ্ণব—অনেক উপাখ্যান সারা বইতে ছড়িয়ে আছে। তবে আমরা যারা ভক্তির কাছে বুদ্ধিকে বিসর্জন দিতে পারিনি, এবং দেশের মধ্যে হিন্দুয়ানির—অন্ধ বিশ্বাসের—সাম্প্রতিক পরিস্ফীতিকে দুর্লক্ষণ ব'লে গণনা করি, আমাদের বিস্মিত না-হ'য়ে উপায় থাকে না, যখন শ্রীমতী চন্দ সতীদের স্মৃতিস্তম্ভে কৃতাঞ্জলিপুটে প্রণাম করেন—সেই সব 'সতী'রা, যাদের কোনো-এক যুগে পতিদের চিতায় বর্বরভাবে পুড়িয়ে মারা হয়েছিলো। যে-সব প্রৌঢ়া

নিষ্ঠাবতীরা আজকাল জপের মালা হাতে নিয়ে বাংলা সিনেমায় যাচ্ছেন, এবং ক্লোক-গগলস-ধারিণী অশ্বারোহিণী নায়িকাসনাথ তীর্থ-স্থানের দৃশ্য দেখে স্বর্গের টিকিট অগ্রিম কেটে রাখছেন, এ-রকম ভক্তির উচ্ছ্বাস তাঁদের পক্ষে স্বাভাবিক, এমনকি অনিবার্য ব'লে মনে করা যেতে পারে, কিন্তু রানী চন্দ—যিনি রবীন্দ্রনাথের, শান্তিনিকেতনের ঐতিহ্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ-ভাবে জড়িত, তাঁর পক্ষে এই মনোবৃত্তি শুধু অশোভন নয়, আশঙ্কাজনক। কিন্তু, এতৎসত্ত্বেও, লেখিকার সার্থকতা এইখানে যে আমাদের মতো মোক্ষলোভরহিত পাঠকরাও বইখানা ধৈর্য ধ'রে শেষ পর্যন্ত প'ড়ে উঠবেন—শুধু তার রচনাগুণেরই জন্য।

শুধু একটা কথা মনে হয়; শ্রীমতী চন্দ, আজকালকার আরো অনেক লেখকের মতো, বড়ো বেশি রকম বিশেষ্যের আগে ক্রিয়াপদের প্রয়োগ—inversion—ক'রে থাকেন, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ-প্রবর্তিত এই কৌশলটি স্বল্পমাত্রায় ব্যবহার না-করলে তার মূল্য থাকে না, বেশি হ'লেই বৈচিত্র্যের বদলে বিশৃঙ্খলা এসে পড়ে। কোথাও-কোথাও আতিশয্য দোষও ঘটেছে, প্রকাশের আগে বইখানা একবার পরিমার্জিত হ'লে আরো ভালো হ'তো।

অশোক মিত্র

কবিতাভবন প্রকাশিত বুদ্ধদেব বসুর বই

গল্প ও উপন্যাস

গল্পসংকলন

লেখকের বিভিন্ন বয়সের বিভিন্ন ধরনের আঠারোটি ছোটো এবং বড়ো গল্প। ছোটোগল্পের কারুশিল্পে বুদ্ধদেব বসুর প্রকৃষ্ট পরিচয় এই বইয়ে পাওয়া যাবে। রয়্যাল আকারে বোর্ডে বাঁধাই। উপহারের উপযোগী। ৫৲

সাড়া

বিখ্যাত প্রথম উপন্যাস। পরিমার্জিত সুদৃশ্য সংস্করণ। ৩৷৷০

বিশাখা

একটি করুণ মধুর রসোজ্জ্বল কাহিনী। মনোরম প্রচ্ছদ। ২৷৷০

একটি সকাল ও একটি সন্ধ্যা ৷৷০

একটি কি দুটি পাখি ।/০

কবিতা

কঙ্কাবতী

কাপড়ে বাঁধাই। ২৸০

দময়ন্তী

কাপড়ে বাঁধাই। ৩৲

বিদেশিনী ৷৷০

প্রবন্ধ

কালের পুতুল

আধুনিক বাংলা কবিতা ও কবিদের বিষয়ে প্রামাণিক গ্রন্থ। ৪৲

Published quarterly at Kavitabhavan, 202 Rashbehari Avenue, Calcutta 29. Yearly Rs. 4/-, or 6s. 6d, or $ 1. 50.

Editor & Publisher : BUDDHADEVA BOSE